KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন : (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৩২/- ৩২/- ৩৩/- ৩৯/-	Year of Publication : বৈশাখ ১৩৯১ || May 1984 কার্তিক ১৩৯১ || Nov 1984 কার্তিক ১৩৯২ || Nov 1985 কার্তিক ১৩৯৮ || Nov 1991
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন : প্রবন্ধের পত্রিকা

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

দ্বাত্রিংশ বর্ষ ॥ বৈশাখ ১৩৯১

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

ত্রিংশ বর্ষ ১ম সংখ্যা ।   বৈশাখ তেরশ একানব্বই

স

সমকালীন ।। প্রবন্ধের পত্রিকা

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ : ছোটদের সংস্করণ ।। নবেন্দু সেন ৫

গান্ধীনামা ।। সোমেন্দ্রনাথ বসু ১২

মহাভারতে আয়ুর্বেদ ও বৈদ্যের স্থান ।। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত ঠাকুর ২৮

শব্দকথায়—প্রতিভাসিক সম্বন্ধ ।। ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৩২

সমালোচনা : প্রসঙ্গ জাঁ পোল সার্ত্র ।। অধীর দে ৩৪

সম্পাদক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক সুশীল প্রিন্টার্স, ২ ঈশ্বর মিল বাই লেন, কলকাতা-৬
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-৮৭ হইতে প্রকাশিত।

একটি শহরের কথা

কলকাতাকে সবার প্রয়োজন। তাই-ত এত লোকের বাস, এত লোকের আনাগোনা, এত ভীড়। কিন্তু যাকে না হলে নয় তার দিকে আমরা শহরবাসী একবারও নজর দিই কি? অবহেলা ও উদাসীনতার মধ্যে দিয়ে শহরটাকে একটা নরকে পরিণত করতে দ্বিধা বোধ করি না। চারিদিকে জঞ্জালের স্তূপ আমরাই তৈরী করি। রাস্তাঘাটে দোকানপাট বসতে আমরাই উৎসাহ দিই। তাদের কাছ থেকে জিনিষপত্র আমরাই কিনি। আবার আমরাই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হই।

এরই মধ্যে যে সব উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে বা হচ্ছে তার কতটুকুই বা আমরা খবর রাখি, কতটুক বা নজরে পড়ে। কিন্তু সমালোচনার শেষ নেই। খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছে ভারতবর্ষের অন্যান্য মেট্রোপলিটান শহরে পানীয়জলের কষ্ট। সেই সব শহরের জনসংখ্যার চেয়ে কলকাতার জনসংখ্যা অনেক অনেক বেশী। কিন্তু কলকাতার পানীয়জলের সমস্যার অনেক সুরাহা হয়েছে—আরও হবে।

কলকাতা শহর এত লোকের ভার নেবার মত করে তৈরী হয়নি। এখন এই শহরের ওপর নির্ভর করে যে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করছেন তাঁদের শহর জীবনের চাহিদা মেটানো প্রধান কাজ। সেজন্য মাটির নীচে সব পাইপ লাইন (জলনিকাশ ও পয়ঃপ্রণালী) ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বদলে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করে অনেক বড় পরিধির পাইপ বসানোর কাজ অনেক জায়গায় হয়েছে। আরও করতে হবে। রাস্তার প্রধান প্রধান মোড়গুলোতে কম্পুটারাইজড্ ট্রাফিক সিগন্যাল বসেছে এবং বসবে। নানা সমস্যার সমাধানের যে চেষ্টা এবং অল্প হলেও যে সাফল্য তা সবাইকে স্বীকার করতেই হবে। যে শহর আমাদের এতদিনের এত প্রয়োজনের এবং এত প্রিয়, সেই শহর একটু ভালর দিকে যাচ্ছে সেটা কি কেউ নজর করে দেখছেন?

আমরা সব সময়েই কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন কিন্তু নিজেদের সম্বন্ধে সচেতন একেবারেই নই। এই শহরের প্রত্যেকটি লোক, বিশেষ করে শিল্পী, বুদ্ধিজীবী, শিল্পপতি এবং প্রতিষ্ঠানগুলো এই শহরে যাঁদের বসবাস তাঁরা এই শহরের জন্য কতটা চিন্তা করেন? কলকাতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হল অর্থনৈতিক সমস্যা। সে সম্বন্ধে কি করা যায়, তার চিন্তা কোথায়?

কলকাতা শতাব্দীর পর শতাব্দী বাঁচবে। তাই আমাদের আশা যে সবাই এই শহরের উন্নয়নে গঠনমূলক কাজে সাহায্য করবেন।

(জনসংযোগ বিভাগ, ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলেপমেণ্ট অথরিটি, ৩-এ অকল্যাণ্ড প্লেস, কলকাতা-৭০০০১৭)

সমকালীন

বর্ষ ৩২ বৈশাখ ১৩৯১

প্রসঙ্গঃ ছোটদের সংস্করণ

নবেন্দু সেন

"নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারি নির্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্ধ খণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারি সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন জানিতে পারি নাই। আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য—অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃন্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।"

কৈশোর ও বাল্যের অবগুণ্ঠন সরিয়ে মৃন্ময়ীর রমণী-প্রকৃতি তার সারা শরীরে ও সমস্ত অন্তরে একদিন রেখায় রেখায় ভরে উঠল। তার যৌবনের এই গোপন সঞ্চার মানব-জীবনের দৈহিক এবং মানসিক স্তর মাত্র। অথচ মানবাচরণের দিক থেকে তারা স্বতন্ত্র। পৃথক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আবার এই গুণগুলিই একত্রে মানব-জীবনের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য। শৈশব তাই স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে অথণ্ড মানব-জীবনেরই নিরবচ্ছিন্ন সূত্রপাত। শিশুর অপার কৌতূহল ও বিস্ময় পরিণত বয়স্কর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতায় একদিন ক্রমশ বিকশিত হয়ে ওঠে। কিন্তু, কোন দিন? কখন? কেউ জানে না। সুখদ শৈশব স্মৃতি হয়ে যায়। ভরা যৌবন মুহূর্তে বর্তমান হয়ে ওঠে। কিন্তু উভয়ের স্বভাব স্বতন্ত্র। সুতরাং সর্বকালেই সমস্ত মৃন্ময়ীরই দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে ওঠে। ফটিকের মতো সব তের-চৌদ্দ বৎসরের ছেলেই "মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এই জন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্বদা লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ, এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ কাতরতা জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোনো সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিম্বা সখ্য লাভ

করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্ম-বিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না; কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মতো হইয়া যায়।"

এই সমস্যা জটিলতর বড়দের জন্যে লিখিত গ্রন্থের ছোটদের সংস্করণের ক্ষেত্রে। এখানেই নানা প্রশ্নের উদ্ভব। যে বিষয় বড়দের জটিল অভিজ্ঞতায় পুষ্ট তা ছোটদের মতো করে কি ভাবে উপস্থিত করা হবে? এই ছোটরা কত ছোট? কী তাদের বয়স? বয়স্ক জগতের সঙ্গে কোথায় তাদের সম্পর্ক?

যেহেতু শৈশব—কৈশোর—যৌবন মানব জীবনের পরম্পরায় গ্রথিত স্তর সেই জন্যেই শৈশব অথবা কৈশোরকে বিচ্ছিন্নরূপে দেখাও চলে না। একটি স্তরের মধ্যেই আর একটি স্তরের সম্ভাবনা সুপ্ত থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দেহ ও মনের পুষ্টি বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন জটিলতর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে। তারপর ছোটও একদিন 'বড়' হয়ে ওঠার অনুভূতিতে বিস্মিত ও আনন্দিত হয়। অথচ একথাও ঠিক, প্রতিটি স্তরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র। একজন শিশু-সাহিত্যিকের সমস্যা এখানে। এই স্বাতন্ত্র্য ও সামগ্রিকতার সাম্য সাধনেই শিশু-সাহিত্যিকের কৃতিত্ব। মনে রাখা দরকার—

"দয়া করে বঞ্চিত করাকে দয়া বলে না। আমার মত এই যে, যাদের মন কাঁচা তারা যতটা স্বভাবতঃ পারে নেবে, না পারে আপনি ছেড়ে দিয়ে যাবে, তাই বলে তাদের পাতটাকে প্রায় ভোজ্য-শূন্য করে দেওয়া সদ্ব্যবহার নয়। ছেলেদের পড়ার বই যারা লেখেন, দেখি তারা প্রচুর পরিমাণে ফেনার যোগান দিয়ে থাকেন। এইটে ভুলে যান জ্ঞানের যেমন আনন্দ আছে তেমনি তার মূল্যও আছে; ছেলেবেলা থেকে মূল্য ফাঁকি দেওয়ার অভ্যাস হতে থাকলে যথার্থ আনন্দের অধিকারকে ফাঁকি দেওয়া হয়।" ২

এই মূল্য ফাঁকি যাতে না পড়ে তার জন্য এক্ষেত্রেও গ্রহণ বর্জনের-নীতিই মেনে চলতে হয়। কতটুকু গৃহীত হবে এবং কতটুকু বর্জিত হবে এবং কেমন করে তা সাজিয়ে উপস্থিত করতে হবে তা ঠিক করা কঠিন। তার জন্যে শিশুর মনের খবর জানা আবশ্যক। যেমন জানতেন লুইস ক্যারোল (১৮৩২—১৮৯৮)। তিনি বলেছেন—

"I think a child's first attitude to the world is a simple love for all living things. And he will have learned that the best work a man can do is when he works for love's sake only, with no thought of fame or gain or earthly reward. No deed of ours, I suppose, on this side of the grave, is really unselfish. Yet if one can put forth all one's powers in a task where nothing of reward is hoped for but a little child's whispered thanks and the airy touch of a little child's pure lips, one seems to come somewhere near is this." ৩

আজকের মানবকে আগামী দিনের মানব জীবনের পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করবার দায়িত্ব শিশু-সাহিত্যিকেরা থাকে। ছোটদের সংস্করণের ক্ষেত্রে এই বোধটি সবচেয়ে জরুরী। বাংলা

শিশু-সাহিত্যের ইতিহাসে বহু সংখ্যক গ্রন্থ আছে যেগুলি মূলে বড়দের জন্যেই লিখিত হয়েছিল পরে তার থেকে ছোটদের সংস্করণ করা হয়েছে। এই রীতিতে পৃথিবীর সব শিশু-সাহিত্যের ইতিহাসেই ছোটদের সংস্করণ রচিত হয়েছে। যেমন—Charles Lamb (1775-1834) Shakespeare-এর নাটকগুলি অবলম্বনে Tales from Shakespeare (1807) উপহার দিয়েছিলেন ছোটদের। বাংলায় ছোটদের উপযোগী পৃথক সংস্করণের সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫) এবং দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪) দিয়ে। ভক্তিলতা ঘোষ ১৯১৯-এ এই বই দুটির ছোটদের সংস্করণ করেন। বঙ্কিমের 'আনন্দমঠের' ছোটদের সংস্করণ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৯৪৫-এ। বঙ্কিম, শরৎ ও রবীন্দ্রনাথের বইয়ের ছোটদের সংস্করণের মধ্যে সংখ্যায় বঙ্কিমের রচনাই বেশি। পঞ্চাশের দশকের মধ্যে প্রকাশিত বঙ্কিমের বইয়ের সংস্করণের একটি হিসাব এখানে দেখা যেতে পারে।

দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬৫), ছোটদের সংস্করণ করেন ১৯১৯ ও ১৯৫৯-এ যথাক্রমে ভক্তিলতা ঘোষ এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। কপালকুণ্ডলার (১৮৬৬) তিনটি সংস্করণ হয় ১৯২৪-এ, ১৯৪৬-এ এবং ১৯৫৭-য় সম্পাদনা করেন যথাক্রমে শিশিরকুমার নিয়োগী, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। মৃণালিনীর (১৮৬৯) সংস্করণ করেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৯৫০-এ। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৫), রাধারাণী, (১৮৭৭), রজনী (১৮৭৭), কৃষ্ণকান্তের উইল (১৮৭৮), রাজসিংহ (১৮৮২), আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী (১৮৮৪), সীতারাম (১৮৮৭) এবং কমলাকান্তের দপ্তরের (১৮৮৫) ছোটদের সংস্করণ করেছিলেন। সংস্করণগুলি যথাক্রমে ১৯৫৩, ১৯৫৯, ১৯৫৯, ১৯৫৯, ১৯৬৮, ১৯৫৮, ১৯৫৯, ১৯৫০, ১৯৪৯, ১৯৫৮ এবং ১৯৫৯-এ প্রকাশিত হয়। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য এবং শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বইগুলি ছোটদের সংস্করণ করেছিলেন। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত ছোটদের সংস্করণে (বঙ্কিমের) মধ্যে চন্দ্রশেখর (১৯৪৫), রজনী (১৯৪৫), রাজসিংহ (১৯৪৫), আনন্দমঠ (১৯৪৫) সন্ধান পাওয়া যায়। অন্যদিকে পূর্বে উল্লিখিত বই ব্যতীত অন্য যে বইয়ের (বঙ্কিমের) সংস্করণ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় করেছিলেন সেগুলি হল: কৃষ্ণকান্তের উইল (১৯৪৭), রাজসিংহ (১৯৪৭), আনন্দমঠ (১৯৪৬) এবং সীতারাম (১৯৪৬)। এ ছাড়া আনন্দমঠের আরো ছোটদের সংস্করণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত (১৯৪৭-এ), বিনয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, চন্দ্রকান্ত দত্ত সরস্বতী এবং সুবোধচন্দ্র চৌধুরী। লোকরহস্য (১৮৭৪) এবং মুচিরামগুড়ের জীবন-চরিতের (১৮৮০) ছোটদের সংস্করণ করেছিলেন শিশির নিয়োগী; ১৯৫৫-য় তা প্রকাশিত হয়েছিল।

এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমের একমাত্র 'ইন্দিরা' ব্যতীত আর সমস্ত উপন্যাসেরই ছোটদের সংস্করণ হয়েছে। সর্বাধিক হয়েছে 'আনন্দমঠের'। দেবীচৌধুরাণীর চারটি সংস্করণ হয়েছিল। সম্ভবতঃ রবীন্দ্রনাথের তাত্ত্বিক উপন্যাসের ছোটদের সংস্করণ করার সাহস কোন সম্পাদকের হয়নি। অবশ্য শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেরাই ছোটদের জন্য স্বতন্ত্র বই লিখেছিলেন। বঙ্কিম তা করেননি। বস্তুতঃ বঙ্কিমের কোন রচনাই ছোটদের জন্য ছিল না। তবু বঙ্কিমের বইগুলিই ছোটদের সংস্করণ অধিক হয়েছে। তার কারণ সম্ভবতঃ বঙ্কিমের উপন্যাসের উপকরণ ও পটভূমি। বঙ্কিম মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবন-যন্ত্রণার অথবা জীবনাচরণের কোন কথাই সমস্যা হিসাবে তাঁর

উপন্যাসে স্থান দেননি। ঐতিহাসিক চরিত্র ও ঘটনার পটভূমিতে নারী পুরুষের প্রেমের সমস্যা উপস্থিত করেছেন। সেখানে রোমান্টিক সৌন্দর্যবোধ এবং ঐতিহাসিক ঘটনা প্রীতিতে শৌর্য-বীর্য, শক্তি ও সৌন্দর্যের যে রূপ ও রস সৃষ্টি করেছে তাঁর রচনায় তাতে ছোটদের ভালো লাগার উপকরণ বর্তমান আছে। যুদ্ধ, তরবারি, অশ্ব, বাদশা, বেগম, সৈন্য, সেনাপতি, রাজা, রাণী, জমিদার, সন্ন্যাসী, বন্ধুক, রাজপুত্র বীরত্ব এবং মুঘল ঐশ্বর্যের বর্ণনা ছোটদের আকর্ষণ করার কতকগুলি উত্তম উপকরণ। এই সমস্ত সুযোগ ও সম্ভাবনার জন্যে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির ছোটদের সংস্করণ করতে অধিক আগ্রহ লক্ষিত হয়।

কিন্তু এক্ষেত্রেও সমস্যার সমাধান হয় না। বঙ্কিমের সমস্ত উপন্যাসই কী ছোটদের? উপযুক্ত সম্পাদনায় কী 'বিষবৃক্ষ' ছোটদের হতে পারে? তাহলে চরিত্রহীন ও 'চোখের বালি' ও ছোটদের সংস্করণ হতে পারে! এসব প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর ছোটদের সংস্করণ যাঁরা করেছেন তাঁদের 'জানা ছিল বলে মনে হয় না। গ্রন্থ নির্বাচন এবং সম্পাদনার নির্দিষ্ট অভাবে ছোটদের সংস্করণের অধিকাংশই বস্তুতঃ সংক্ষিপ্ত সংস্করণে রূপ নিয়েছে। অল্প সময়ে মূল গ্রন্থের বিষয়টুকু জানবার 'মেড ইজি' জাতীয় রচনার সঙ্গে শিশু-সংস্করণের পার্থক্য একাকার করে ফেলেছেন তাঁরা। এ প্রসঙ্গে একজন ছোটদের সংস্করণের সম্পাদকের মন্তব্য দেখা যেতে পারে এখানে।

"সমালোচকেরা বলেন, বঙ্কিম-সাহিত্য এখন ক্লাসিকের পদবীতে উপনীত হইয়াছে; কথাটা যে সত্য তাহার সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য যতটা জনপ্রিয় বলিয়া বাহ্যতঃ বোধহয় কার্যতঃ ততটা নয়। দেশে শিক্ষার প্রসার যে পরিমাণে বাড়িতেছে বঙ্কিমের পাঠক সংখ্যা সে অনুপাতে ভরিতেছে না বরং কমিতেছে।.....ছাত্রজীবনই ঐ সকল সাহিত্য পাঠের উপযুক্ত সময়। কর্ম-জীবনে প্রবেশ করিবার পর অবসর এবং উৎসাহ দুইয়ের অভাব ঘটে। অনেক সময় ইচ্ছা থাকিলেও অবকাশ মিলে না। তাছাড়া গ্রন্থের আয়তন ও গ্রন্থারম্ভের একটা প্রবল অন্তরায়। ইংরাজী অনেক গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ আছে, বাঙ্গালায় সেরূপ বেশি হয় নাই। যাহা হইয়াছে তাহারও অধিকাংশ মূলের সহিত সম্পর্ক রহিত।.....লেখকের ভাষায় ভাবের যে একটি অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধ আছে তাহা অবিচ্ছেদ্য। সংক্ষিপ্তসার রচয়িতৃগণ সে কথা অনেক সময় ভুলিয়া যান। এরূপ সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সম্পাদনের প্রধান উদ্দেশ্য ক্ষুদ্রতর পরিধির মধ্যে মূল গ্রন্থের রস পরিবেশন। যাঁহারা বাঙ্গালাদেশের ক্লাসিক লেখকগণের পরিচয় পাইতে চান অথচ সময়াভাব বশতঃ পারে না; এরূপ গ্রন্থ তাঁহাদের কাজে লাগিবে। তরুণ-বয়স্ক-পাঠক-পাঠিকার পক্ষেও এইরূপ পুস্তকের উপযোগিতা স্বীকৃত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। মূলের রস যতটা বজায় রাখিয়া যতটা কমানো যায়, কমানো হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষায় হস্তক্ষেপ করা হয় নাই। পারম্পর্য রক্ষার জন্য যতটুকু নিজে যোগ করিয়াছি তাহাও ছোট অক্ষরে স্বতন্ত্র মুদ্রিত করা হইয়াছে। সম্পাদকের এই বক্তব্যের পাঁচটি সূত্রে লক্ষিত হচ্ছে:

(১) ছাত্রজীবনই ঐ সকল সাহিত্যপাঠের উপযুক্ত সময়। কর্মজীবনে প্রবেশ করিবার পর অবসর এবং উৎসাহ দুইয়েরই অভাব ঘটে।

(২) তাহা ছাড়া গ্রন্থের আয়তনও গ্রন্থারম্ভের একটা প্রবল অন্তরায়।

(৩) মূল গ্রন্থের ভাব ও ভাষার অঙ্গাঙ্গি সম্বন্ধের কথা সংক্ষিপ্তসার রচয়িতাগণের স্মরণ রাখা

কর্তব্য।

(৪) পারম্পর্য রক্ষার জন্য যতটুকু যোগ করার তা ক'রে স্বতন্ত্র হরফে স্বীকার করা কর্তব্য।

(৫) বাংলার ক্লাসিক লেখকগণের পরিচয় পেতে চান, অথচ সময়াভাব বশতঃ পারেন না যাঁরা তাঁদের এরূপ বই কাজে আসবে। তরুণ বয়স্ক পাঠক-পাঠিকার পক্ষেও এরূপ পুস্তকের উপযোগিতা আছে।

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে এই সম্পাদিত বইয়ের পাঠক কারা সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা সম্পাদকের ছিল না। ১ ও ৫ সংখ্যক বক্তব্য এদিক থেকে স্ববিরোধী। ক্লাসিকসের রসাস্বাদন এবং গ্রন্থের আয়তনের প্রশ্ন সম্পূর্ণ অবান্তর। ৩ ও ৪ এর বক্তব্যও অস্পষ্ট। মূলের ভাব ও ভাষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও সম্পাদনার ক্ষেত্রে ভাব বস্তু ও ভাষার প্রয়োজনে গ্রহণ অথবা বর্জন করেছেন। সব শেষে প্রশ্ন থেকে যায় এ সংস্করণ কাদের জন্য? বড়দের শ্রম ও সময় বাঁচানোর জন্য না, তরুণ-বয়স্ক পাঠক পাঠিকাদেরই জন্য? না, কি একই সঙ্গে উভয় শ্রেণীর পাঠকদের জন্য? বয়স্ক মানসিকতায় এই সংক্ষিপ্তকরণ অনুপযুক্ত এবং অপরিণত বুদ্ধির কারণও হয়ে দাঁড়ায়। ফলত ছোটদের সংস্করণ আর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ একাকার হয়ে যায় এখানে।

সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্রেই শিশুপাঠ্য নাও হতে পারে। আবার শিশুপাঠ্য গ্রন্থ মাত্রেই সংক্ষিপ্ত হবে এমন কোন বিধি নেই। মনে রাখা দরকার abriged edition আর children edition-এর মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। দুটি স্বতন্ত্র বিষয়। প্রথম ক্ষেত্রে বর্জন অপেক্ষা সংস্করণের উপরই গুরুত্ব অধিক দেওয়া হয়। এখানে মূলের ভাব ও বস্তু অক্ষুণ্ণ রেখে সংক্ষেপে তার বর্ণনা দেওয়াই বড় কথা। অপর পক্ষে ছোটদের সংস্করণে শিশুসাহিত্যের নিষিদ্ধ বিষয়গুলি বর্জন করা হল। রাজশেখর বসুর রামায়ণ মহাভারত ছোটদের জন্য নয়, বড়দেরই জন্য। কিন্তু উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ছেলেদের মহাভারত রামায়ণ ছোটদের সংস্করণ।

কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ছোটদের সংস্করণ এবং সংক্ষিপ্ত সংস্করণের পার্থক্য না করে, ছোটদের সংস্করণের কোন নির্দিষ্ট আদর্শ না মেনে ছোটদের জন্য অথবা 'ছেলেদের জন্যে' বড়দের বইয়ের শিশু সংস্করণ করা হয়েছে। তার ফলে সেই সংস্করণও বস্তুত বড়দেরই সংস্করণ অথবা বড়দেরও নয়, ছোটদেরও নয় এমন অপ্রয়োজনীয় সংস্করণ হয়ে উঠেছে। ভাব, ভাষা ও বস্তুর গ্রহণ বর্জনে কোন নীতিই এখানে অনুসৃত হয়নি। সম্পাদকেরা, দ্বিধা গ্রস্ত। যা ছোটদের জাতব্য তা বহুক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত করণের খাতিরে বর্জিত হয়েছে, আবার যা বড়দের জীবনের সমস্যা, ছোটদের তা জানার কথা নয় তাও অনায়াসেপরিবেশিত হয়েছে। যেমন, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমের মূল গ্রন্থের চতুর্থ গর্ভাঙ্কের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। অথচ এই পরিচ্ছেদেই গ্রন্থের মূল তাৎপর্য নিহিত। ভারতে ইংরেজ শাসনের কথা। মুসলমান শাসন ব্যবস্থার কথা। হিন্দুধর্মের অবক্ষয় এবং দস্যুবৃত্তিতে দেশোদ্ধার অসম্ভব। কাজ ও জ্ঞানার সম্পর্কের কথা সংক্ষিপ্ত সংস্করণে কিছুই নেই। কল্যাণী ও শান্তির জ্ঞান ও কর্মের রূপকটিও নেই। সম্পাদক এই বিষয়গুলি কেন গ্রহণ করেনি তার কোন স্পষ্ট উত্তরও কোথাও পাওয়া যায় না। জাতীয় কর্ম ও জ্ঞানের জটিলতা সরল রূপেও দেওয়া যেত। যদি ধরা যায় তরুণ বয়স্ক পাঠক পাঠিকাদের ধর্মীয় ও শাস্ত্রীয়

জটিলতার কথা শোনাবেন না—এরূপ একটি নীতির অনুসরণ করেছেন এখানে তা'হলে প্রশ্ন ওঠে গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত এই কারণ অনুসরণ তিনি করেছেন কিনা। দেখা যাক। প্রথম খণ্ডের ষোড়শ পরিচ্ছেদে (মূলে) আছে—

"সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না। মলিন, গ্রন্থযুক্ত বসন পরিয়া সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, বোধ হইল যেন, গৃহ আলো হইল। বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছের কত ফুলের কুড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল; বোধ হইল যেন, কোথায় গোলাপ জলের কার্ব্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্ব্বা ভাঙিয়া ফেলিল। যেন কে প্রায় নিবান আগুনে ধুপ-ধুনা গুগ্‌গুলি ফেলিয়া দিল। সে রূপসী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ স্বামীর অন্বেষণ করিতে লাগিল, প্রথমে তো দেখিতে পাইল না, তারপর দেখিল, গৃহ প্রাঙ্গণে একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষ আছে, আম্রের কাণ্ডে মাথা রাখিয়া জীবানন্দ কাঁদিতেছেন। সেই রূপসী তাহার নিকট গিয়া ধীরে ধীরে তাহার হস্তধারণ করিল। বলি না যে, তাহার চোখে জল আসিল না, জগদীশ্বর জানেন যে, তাহার চোক্ষে যে স্রোতঃ আসিয়াছিল, বহিলে তাহা জীবানন্দকে ভাসাইয়া দিত; কিন্তু সে তাহা বহিতে দিল না। জীবানন্দের হাতে হাতে লইয়া বসিল, "ছি, কাঁদিও না; আমি জানি, তুমি আমার জন্য কাঁদিতেছ, আমার জন্য তুমি কাঁদিও না।—

তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।" সম্পাদিত সংস্করণে এই অংশটি হল "সে স্ত্রীলোকের বয়স প্রায় পঁচিশ বৎসর, কিন্তু দেখিলে নিমাইয়ের অপেক্ষা অধিক বয়স্কা বলিয়া বোধ হয় না।.....সেই রূপসী তাহার নিকটে গিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার হস্ত ধারণ করিল। বলিল, 'ছি, কাঁদিও না—তুমি যে প্রকারে আমাকে রাখিয়াছ, আমি তাহাতেই সুখী।"—মন থেকে যে অংশ এখানে বর্জিত হয়েছে তাও শিশুমনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয় না, কোন কঠিন সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয় না। বর্জিত অংশ শিশুমনে কোন ক্ষতি সাধন না করলে সে বর্জন কেবল সংক্ষিপ্ত করার জন্যেই করা হয়েছে বলা যায়। এরূপ বর্জন ছোটদের সংস্করণেও বাঞ্ছিত নয়, বড়দেরো নয়। বরং যে অংশটির বর্জন অভিপ্রেত ছিল সেই "হস্তধারণ" এখানে বর্জিত হয় নি। নারী পুরুষের প্রেমের বর্ণনায় যৌন প্রসঙ্গও যেমন ছোটদের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত তেমনি প্রেমের ভিস্‌য়্যাল এফেক্ট সৃষ্টি হয় এমন বর্ণনাও ছোটদের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত। এ সমস্ত বিষয়ে সম্পাদককে যে সতর্কতা অবলম্বন করতে হয় তা বর্তমান ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ, পঞ্চম ও ষোড়শ পরিচ্ছেদের কল্যাণী—ভবানন্দ প্রসঙ্গ, ভবানন্দ জীবানন্দ প্রসঙ্গ এবং ভবানন্দের কৃতকর্মের বিস্তৃত, প্রসঙ্গ সম্পাদক অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ভবানন্দ-কল্যাণী প্রসঙ্গটি সম্পাদকের কলমে দাঁড়াচ্ছে—"ঐ বাড়ির দ্বিতলের একটি কক্ষে রোগগ্রস্তা দেবীর মত এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী বসিয়া ছিলেন॥ ইনি কল্যাণী। ভবানন্দ কল্যাণীকে শিক্ষা দান করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে এখানে আসিতেন। ভবানন্দ পণ্ডিত ও সন্ন্যাসী হইলেও স্থিরচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন না। কল্যাণীর রূপে তিনি মুগ্ধ হইলেন। ভবানন্দ সে কথা তাঁহার নিকট প্রকাশ করাতে কল্যাণী তাহাকে ব্রতচ্যুত অধর্মী বলিয়া তিরস্কার পূর্বক বিদায় করিলেন।" প্রেম ভালবাসার এই প্রসঙ্গ সম্পাদক 'তরুণ-তরুণী পাঠক পাঠিকা'র নিকট গোপন রাখেন নি, কিন্তু কল্যাণী কর্তৃক সুকুমারীকে স্তন্য দান করার প্রসঙ্গটি পরিহার করেছেন। কেন?

'স্তন' শব্দটির জন্য কী? তাহলে স্পষ্টই বোঝা যায় সম্পাদক নির্দিষ্ট কোন আদর্শ গ্রহণ করতে পারেন নি। এই আদর্শহীনতার জন্য মূল গ্রন্থের অনেক ঐশ্বর্য, (যেমন বঙ্কিমের কাব্যগুণ) থেকে পাঠক বঞ্চিত হয়েছেন অকারণে। যেমন:

(ক) ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম—কি পুণ্যবলে বলিতে পারিনা—আমি এক অপূর্ব স্থানে গিয়াছি। সেখানে মাটি নাই। কেবল আলো, অতি শীতল মেঘভাঙ্গা আলোর মত বড় মধুর আলো। সেখানে মনুষ্য নাই, কেবল আলোময় মূর্তি, সেখানে শব্দ নাই, কেবল অতি দূরে যেন কি মধুর গীতবাদ্য হইতেছে, এমনি একটা শব্দ। সর্বদা যেন নূতন ফুটিয়াছে, এমনি লক্ষ লক্ষ মল্লিকা, মালতী, গন্ধরাজের গন্ধ।

(খ) রজনী ঘোর তমোময়ী। তাহাতে সেই অরণ্য অতি বিস্তৃত, একেবারে জনশূন্য, অতিকায় নিবিড়, বৃক্ষলতা দুর্ভেদ্য, বন্য পশুরও গমনাগমনের বিরোধী। বিশাল জনশূন্য, অন্ধকার, দুর্ভেদ্য, নীরব! রবের মধ্যে দূরে ব্যাঘ্রের হুঙ্কার অথবা অন্য শ্বাপদের ক্ষুধা, ভীতি বা আস্ফালনের বিকট শব্দ। কদাচিৎ কোন বৃহৎ পক্ষীর পক্ষ-কম্পন, কদাচিৎ তাড়িত এবং তাড়নাকারী, বধ্য এবং বধ্যকারী পশুদিগের দ্রুতগমন শব্দ। সেই বিজনে অন্ধকারে ভগ্ন অট্টালিকার উপর বসিয়া একা ভবানন্দ।

অধ রেখাঙ্কিত অংশটুকু ব্যতীত সম্পাদনায় সমস্ত অংশটুকু বর্জিত হয়েছে। তবে এই ত্রুটি একা অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত বঙ্কিমের গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণের মধ্যেই সীমিত নয়। দ্বিধাগ্রস্ত এই মানসিকতার ব্যাপক পরিচয় অন্যান্যদের ক্ষেত্রেও প্রকট। আমরা নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এবং খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত গ্রন্থগুলির ক্ষেত্রেও এই দ্বিধা এবং নির্দিষ্ট আদর্শ অথবা নীতি বিহীন অস্পষ্টতা লক্ষ্য করতে পারি। যেমন সীতারাম (১৮৮৭) বইটি। এই গ্রন্থের তৃতীয় অঙ্কের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে রাজাদেশে 'জয়ন্তীর শাস্তি প্রাপ্তির বর্ণনায় বঙ্কিম লিখেছেন—

"জয়ন্তী তখন অপরিম্লান মুখে, জনসমারোহকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, রাজাজ্ঞায় এই মঞ্চের উপর বিবস্ত্র হইব। তোমাদের মধ্যে যে সতীপুত্র হইবে, সেই আপনার মাতাকে স্মরণ করিয়া ক্ষণকালের জন্য এখন চক্ষু আবৃত করুক। যাহার কন্যা আছে, সেই আপনার কন্যাকে মনে করিয়া, আমাকে সেই কন্যা ভাবিয়া চক্ষু আবৃত করুক। যে হিন্দু, যাহার দেবতা প্রাঙ্গণে ভক্তি আছে, সেই চক্ষু আবৃত করুক। যাহার মাতা অসতী, যে বেশ্যার গর্ভে জন্মিয়াছে সে যাহা ইচ্ছা করুক তাহার কাছে আমার লজ্জা নাই। আমি তাহাদের মনুষ্যের মধ্যে গণ্য করিনা।"

তুমি রাজ্যেশ্বর; তোমার পশুবৃত্ত দেখিলে প্রজারা কিনা করিবে? মহারাজ আমি বনবাসিনী বনে থাকিতে গেলে অনেক সময় বিবস্ত্র হইতে হয়। একদা আমি বাঘের মুখে পড়িয়াছিলাম—বাঘের মুখ হইতে আপনার শরীর রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু বস্ত্র রক্ষা করিতে পারি নাই। তোমাকেও আমি, তোমার আচরণ দেখিয়া সেইরূপ বন্য পশু মনে করিতেছি, অতএব তোমার কাছে আমার লজ্জা হইতেছেনা। কিন্তু তোমার লজ্জা হওয়া উচিত – কেননা, তুমি রাজা এবং গৃহী, তোমার মহিষী আছেন, চক্ষু বুজ।

বুধা বলা। তখন মহাক্রোধান্ধভাবে রাজা একেবারে অন্ধ হইয়াছেন। জয়ন্তীর কথার কোন উত্তর না দিয়া কসাইকে বলিলেন, "জবরদস্তী কাপ্‌ড়া উতার লেও।"

তখন জয়ন্তী আর বৃথা কথা না কহিয়া, জানু পাতিয়া মঞ্চের উপর বসিল। জয়ন্তী আপনার কাছে আপনি ঠকিয়াছে,—জয়ন্তী মনে করিয়াছিল যখন পৃথিবীর সকল সুখ দুঃখে জলাঞ্জলি দিয়াছি, যখন আর আমার সুখও নাই, দুঃখও নাই, তখন আমার আবার লজ্জা কি? ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে আমার মনের যখন কোন সম্বন্ধ নাই তখন আমার আর বিবস্ত্র আর সবস্ত্র কি?.....কিন্তু এখন যখন বিবস্ত্র হইবার সময় উপস্থিত হইল—কখন কোথা হইতে এই পাপ লজ্জা আনিয়া সেই ইন্দ্রিয় বিজয়িনী সুখ-দুঃখবর্জ্জিতা জয়ন্তীকেও অভিভূত করিল। তাই নারীজন্মকে ধিক্কার দিয়া জয়ন্তী অঞ্চলে জানু পাতিয়া বসিল।"

অধরেখাঙ্কিত শব্দগুলি ব্যতীত সীতারামের খগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত সংক্ষিপ্ত সংস্করণে মূলের অন্য সমস্ত কথাই অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং খগেন্দ্রনাথ দুজনেই এই পদ্ধতিতে সম্পাদনার কাজ করেছেন। এই সামান্য বর্জন ক্রিয়াই 'অসতী' এবং 'বেশ্যা' শব্দ দুটির প্রয়োগই সমস্তার সৃষ্টি করেছিল বোঝা যায় কিন্তু "বৃথা বলা !.....অন্ধ হইয়াছেন," অংশটুকুতে বয়স্ক অথবা শিশুজগতে কোথাও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। তাহলে এটুকু সংক্ষেপ করার জন্যেই সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার এই সংক্ষিপ্ত সংস্করণগুলির অধিকাংশই আবার স্কুল কলেজের লাইব্রেরীর জন্য; অথবা বিদ্যালয়ের পুরস্কার তালিকার অন্তর্ভুক্ত। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত। অথচ মূল গ্রন্থের সম্পাদনা ও সংক্ষিপ্ত করনের কোন স্পষ্ট রীতি বা নিয়ম অনুসৃত হয়নি। বিভিন্ন সম্পাদকের ব্যক্তিগত নীতিবোধ ও রুচিবোধের দ্বারাই এই কাজ সম্পাদিত হয়ে এসেছে। কিন্তু যিথাগ্রস্তভাবে থাকলেও, সম্পাদকের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল 'বালক-বালিকাদের' জন্যেই 'ছাত্রপাঠ্য' 'কিশোর সংস্করণ' করা। ফলে 'ছোটদের জন্যে' 'ছেলেদের জন্যে' তারা এই ধরণের সংস্করণ প্রকাশে সক্রিয় হয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ কিশোর, কিশোরী এই ধরণের বইয়ের পাঠকও হয়। অতএব সমাজ সেবা ও নীতির ভবিষ্যতের সঙ্গে অন্তত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত যে মানব সম্প্রদায় এই গ্রন্থগুলির পাঠক তাঁদের সামাজিক স্বাস্থ্য গড়ে তুলবার এক বিশাল দায়িত্ব রয়েছে এই সম্পাদক সম্প্রদায়েরও। Child psychology সম্বন্ধে প্রত্যেক শিশুসাহিত্যিকেরই সচেতন থাকা দরকার; এই ধরণের বড়দের বই ছোটদের উপযোগী করেন যারা তাঁদেরও সমপরিমাণে এই বিষয়ে জ্ঞান থাকা কর্তব্য। একদিকে বস্তুজগৎ সম্পর্কে শিশুর অপরিণত মানসিকতার অপার কৌতূহল অন্য দিকে বস্তুজগতের সহস্র জটিল তত্ত্ব ও চিন্তার সঙ্গে জড়িত বয়স্ক জগতের পরিণত ভাবনা;—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য সাধন অত্যন্ত কঠিন কিন্তু শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে তার প্রয়োজনও অপরিহার্য। জ্ঞান বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এখনকার মানবকেরাও আগেকার তুলনায় অনেক বেশী অনুসন্ধিৎসু; বহু নূতন বিষয়ের সঙ্গে অনেক বেশি পরিচয় হয় এখন। শিক্ষা, দীক্ষার কিছু পরিবর্তনও অবশ্যই ঘটেছে। গ্রামীন জীবনের পরিবর্তে নাগরিক জীবন নির্ভরতাও অনেক বেড়েছে। এই সমস্ত Rational Development' ফল শিশুমনেও পড়ে। কাজেই শিশু বা কিশোর কিশোরীর জগৎকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আপাতভাবে যে সমস্ত বিষয় বড়দের বলে ছোটদের নিকট নিষিদ্ধ করে রাখা হয় তা সত্যি ক'রে

নিষিদ্ধ হয়ে থাকে না। Puberty stage of development'র সঙ্গে সঙ্গে কিশোর কিশোরীর পরিবর্তন আসে। এই পরিবর্তন যেমন দৈহিক তেমনি মানসিক। সুতরাং তাদের পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে। এই সমস্ত কারণে পৃথিবীর বহু জায়গায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের যৌন বিজ্ঞানও পড়ানো হয়। বয়স অনুযায়ী যেমন ওষুধের মাত্রা চিকিৎসকেরা ঠিক ক'রে দেন তেমনি শৈশব-বাল্য-কৈশোর-এও বয়স্ক জগতের অনেক বিষয় সম্বন্ধে ধীরে ধীরে স্বাভাবিকভাবে জ্ঞান দান করা সম্ভব। এই জ্ঞান, শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক অগ্রগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কারণ—

"A normal child asks questions around three. A child begins to get more exact ideas about the things that are connected with sex around the ages of 2½/ 3½. This is the "why" stage, when his couriosity branches out in all directions."[৫]

ফলে শিশুর অনন্ত প্রশ্নে তার মা, বাবা অথবা অন্যান্যরা যখন ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন তখন একদিন সে যদি

".....মাকে শুধায় ডেকে
'এলেম আমি কোথা থেকে
কোন্‌খেনে তুই কুড়িয়ে পেলি আমারে।'—

এবং মা যদি সত্যিই উত্তর দেন "ইচ্ছা হয়ে ছিলি মনের মাঝারে"/অথবা "তুই জগতের স্বপ্ন হতে/এসেছিস আনন্দস্রোতে" তাহলে সেই শিশুর কৌতূহল নিবৃত্ত হবে না। যখন সে অন্য উৎস থেকে তার জন্ম রহস্যের কথা জানতে পারবে একদিন, সেদিন তার মায়ের প্রতি সহজ মনোভাব আর থাকবে না। এ সব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা বলেন "Try to answer the question as simply as he asks it. For instance, you can say, A baby grows in a special place inside his mother. You dont have to tell him more than that for the time being of it satisfies him." বস্তুত শিশুর কৌতূহল অনন্ত কিন্তু 'কি ?' 'কেন ?' র উত্তর যদি শিশুর বিশ্বাসযোগ্য হয় তাহলে শিশু কিন্তু সন্তুষ্ট হয়। বস্তু জগতের অজানা বিষয় সম্পর্কে তার 'ইমাজিনেশন্' বা কল্পনা তৈরী হয়। তার উত্তর যদি অবজেক্টিভ হয় তাহলে শিশু সেই কল্পনা—প্রসূত প্রশ্নের সমাধানও সে পেয়ে সন্তুষ্ট হয়। তখন সে আর ঐ একটা বিষয়ের প্রতিই কৌতূহল নিয়ে থাকে না। বিশ্বে তার জানার বস্তু আরো অনেক ছড়িয়ে আছে; অদম্য কৌতূহল নিয়ে সবের প্রতি সে এগুবে এবার।

বস্তুত ছোটদের সংস্করণগুলির সার্থকতা এখানে। পরিণত জগতের জটিল চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে অপরিণত, সবল শৈশবের স্বাতন্ত্র্য অটুট রেখেও উভয়ের বৈশিষ্ট্যের প্রতিষ্ঠা দেওয়া হল এই সংস্করণগুলির মধ্যে। অথচ বাংলা সাহিত্যের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির প্রতি কেউ বিশেষ চিন্তাও করেন নি! সম্পাদকেরা নিজ নিজ ভাল লাগা মন্দ লাগার উপরেই মূল গ্রন্থের থেকে কিছু গ্রহণ করেছেন কিছু বর্জন করেছেন। এই ভাল অথবা মন্দের সঙ্গে শিশুর মানসিক স্বাস্থ্যের কথা তাঁরা কদাচ ভাবেন নি। ফলে বহু সংখ্যক 'ছোটদের সংস্করণ' হওয়া সত্ত্বেও একটা নির্দিষ্ট আদর্শ গড়ে

ওঠেনি। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম পরিচ্ছেদে যেমন সম্পাদক নবকুমারের মানসিক চাঞ্চল্যের বর্ণনা দিয়েছেন—

"একমাত্র পুত্রের মৃত্যুসংবাদে নবকুমারের মাতা একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। এমন সময় যখন নবকুমার সস্ত্রীক হইয়া বাটী আগমন করিলেন, তখন তাহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন্ জাতীয়া, বা কাহার কন্যা? সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল।

নবকুমারের মাতা মহাসমাদরে বধূ বরণ করিয়া গৃহে লইলেন। যখন নবকুমার দেখিলেন যে, কপালকুণ্ডলা তাঁহার গৃহমধ্যে সাদরে গৃহীতা হইলেন, তখন তাঁহার আনন্দ সাগর উথলিয়া উঠিল। সমাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলাকে লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ প্রকাশ করেন নাই। অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। কিন্তু এভাব সর্বদা কথায় ব্যক্ত হইত না। কপালকুণ্ডলাকে দেখিলেই নবকুমার যেরূপ সজললোচনে তাঁহার প্রতি অনিমেষ চাহিয়া থাকিতেন, তাহাতেই প্রকাশ পাইত; যেরূপ নিষ্প্রয়োজনে, প্রয়োজন কল্পনা করিয়া কপালকুণ্ডলার কাছে থাকিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত; যেরূপ বিনাপ্রসঙ্গে কপালকুণ্ডলার প্রসঙ্গ উত্থাপনের চেষ্টা পাইতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত। সর্বদা অন্যমনস্ক সূচক পদনিক্ষেপেও প্রকাশ পাইত। যেরূপ দিবানিশি কপালকুণ্ডলার সুখস্বচ্ছন্দতার অন্বেষণ করিতেন, তাহাতে প্রকাশ পাইত। তাহার প্রকৃতি পর্যন্ত পরিবর্তিত হইতে লাগিল। যেখানে চাপল্য ছিল, সেখানে গাম্ভীর্য জন্মিল; যেখানে অপ্রসাদ ছিল, সেখানে প্রসন্নতা জন্মিল; নবকুমারের মুখ সর্বদাই প্রফুল্ল। হৃদয় স্নেহের আধার হওয়াতে অপর সকলের প্রতি স্নেহের আধিক্য জন্মিল; মনুষ্যমাত্র প্রেমের পাত্র হইল; সকল সংসার সুন্দর বোধ হইতে লাগিল। প্রণয় এইরূপ। প্রণয়—কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।—নুপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদক, ১৩৬৯ ৩৮—৩৯।

প্রসঙ্গটি মূলেও অনুরূপ ভাবেই বর্ণিত, কেবলমাত্র প্রথম স্তবকের "যখন এই সকল……এমত সময়ে……অংশটুকু সম্পাদিত সংস্করণে বর্জিত হয়েছে।

দ্বিতীয় স্তবকে "অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলাকে লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই, এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্যন্তও বাহকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়-সম্ভাষণ করেন নাই; পরিপ্রবেশমুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল; জলরাশির গতিমুখ হতে বেগনিরোধকারী উপল-মোচনে যেমন দুর্দম স্রোতাবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয় সিন্ধু উছলিয়া উঠিল;

এই অধ রেখাঙ্কিত অংশটুকু সম্পাদিত গ্রন্থে যে বর্জিত হয়েছে তার কারণ কি? প্রথম স্তবকের প্রথম পংক্তিটি বর্জন করার পেছনে গ্রন্থের আয়তন হ্রস্ব করার উদ্দেশ্য ব্যতীত মহৎ-কারণ নেই। এই স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তির প্রথম শব্দটিও মূলে যা ছিল তা রাখা হয়নি। বিষয়টি আপাতভাবে হয়ত তুচ্ছ; কিন্তু গুরুত্ব কম নয়। মূলের 'এমত সময়' সম্পাদিত গ্রন্থে সরলীকৃত হয়েছে 'এমন সময়ে' সম্পাদনার ক্ষেত্রে গ্রন্থের মূল বক্তব্যর সঙ্গে তার মূল ভাষাও যতটা সম্ভব অনাহত রাখা উচিত। কারণ ধরাযাক, বঙ্কিমের কোন গ্রন্থের ছোটদের সংস্করণে কেবল বঙ্কিমের বক্তব্যই

ছোটদের নিকট আসবে তার ভাষার সঙ্গে কোন পরিচয় ঘটবে না এটা বাঞ্ছনীয় নয়। ভাষা ভাবের চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। সম মূল্যের। বঙ্কিমচন্দ্রের মত বিশিষ্ট রীতির গদ্যেও মূল্য আরো বেশী। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট ভাষাগত প্রয়োগ আছে যা তাঁর গদ্যকে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করে। সে ভাষার সঙ্গে ছোটরাও অনেকখানি পরিচিত হতে পারে যদি তাদের পাঠ্য এই সংস্করণগুলিতে মূলের ভাষা অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। বিশেষত তাহার মধ্যে ছোটদের মানসিক স্বাস্থ্যহানির কারণ না থাকলে কেবল গ্রন্থের কলেবর প্রকাশের জন্যেই তা বর্জন করতে হবে এমন অলিখিত নীতি অনুসরণ না করাই শ্রেয়। আলোচ্য প্রসঙ্গে 'এমত সময়' পরিবর্তিত করে 'এমন সময়' ব্যবহার করার জন্যে ভাষা প্রয়োগের যুগবৈশিষ্ট্যের অনুচিত দ্বন্দ্বটি ধরা পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে 'এমতকাল', 'এমত রূপে', 'এমতভাবে', 'এমত ব্যবস্থার' অথবা 'এমত সময়ে'র প্রয়োগ স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ১৩৬৮তে যা স্বাভাবিক প্রয়োগ, ১৩৬৯-এ ভাষায় ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিক মনে নাও হতে পারে। সম্পাদকের জগতে তাঁর সমকালীন 'এমন সময়ে'র প্রয়োগ ঘটেছে তাই! কিন্তু তার ফল ক্ষতিকারক। ছোটরা বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়েছে অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা লিখছে না। এক্ষেত্রে ভাবের ন্যায় মূলের ভাষাও যতটা সম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখাই কর্তব্য।

ভাষাগত এই বিচ্যুতি ব্যতীত ভাষাগত ত্রুটিও লক্ষণীয়। দ্বিতীয় স্তবকের সেমিকোলনে নিয়ন্ত্রিত বাক্যাংশে 'প্রণয়লক্ষণ' শব্দটি সম্পাদক বর্জন করেছেন। মূলে আছে। অথচ স্তবকের শেষের বাক্যে? প্রণয় এইরূপ।—প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান্ করে। এটুকুর প্রয়োগে কোন দ্বিধা নেই। সমস্যা তাহ'লে কোথায়? কেবল 'প্রণয়লক্ষণ', 'প্রণয় সিন্ধু' 'প্রণয় সম্ভাষণ' 'পরিপ্রবেমুখ অনুরাগ সিন্ধু' 'পাণি গ্রহণ', শব্দগুলির ব্যবহারে? মনে হয় না। মনে হয় সম্পাদক এখানে স্পষ্টতই দ্বিধাগ্রস্ত। ছোটদের সামনে নববিবাহিত দম্পতির প্রণয়াবেগের বর্ণনা দিতে স্বভাবতই সঙ্কোচ বোধ করেছেন কিন্তু সবটুকু বর্জনও করতে পারেন নি। কপালকুণ্ডলা সম্বন্ধে নবকুমারের অনুরাগসঞ্চারিত মানসিক অস্থিরতার বিশদ বর্ণনা কিন্তু ছোটদের সংস্করণে সম্পাদক দিয়েছেন সেক্ষেত্রে সঙ্কোচ নেই। অর্থাৎ এবিষয়ে কোন নিয়ম অথবা আদর্শ অনুসরণ করে চলা হয়নি। কপালকুণ্ডলার ছোটদের সংস্করণে তৃতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নবকুমার সম্পর্কে লুৎফ-উন্নিসার গভীর প্রেমাকাঙ্ক্ষার কথাও তাই নিবেদন করা হয়েছে।

"প্রথম একদিন অকস্মাৎ স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন বিশেষ কিছু জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তারপর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃপুনঃ সেই মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল। চিত্তের ধর্ম এই যে, মানসিক কর্ম যত অধিকবার করা যায়, সে কর্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়। লুৎফউন্নিসা সেই মূর্তি অহরহঃ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল, সঙ্গে সঙ্গে লুৎফ-উন্নিসা রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন—সকল বিসর্জন দিয়া প্রিয়জনসন্দর্শনে ধাবিত হইলেন। সে প্রিয়জন—নবকুমার।"

এখানে 'দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল' এবং শেষে 'সকল বিসর্জন দিয়া প্রিয়জন সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন' এবং 'সে প্রিয়জন—নবকুমার' পর্যন্ত ছোটদের জানানো হয়েছে অথচ মূলের "নবকুমার

কহিলেন, "আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধনসম্পদ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।"—এই অংশ সম্পাদিত হয়েছে ছোটদের "ক্ষেত্রে নবকুমার কহিলেন ……তোমার দত্ত সম্পদ লইয়া ধর্মভ্রষ্ট হইতে পারিব না" 'ধন' শব্দটি এবং 'যবনীজার' শব্দটি সম্পাদিত হয়ে প্রথমটি বর্জিত হয়েছে দ্বিতীয়টি 'ধর্মভ্রষ্ট' হয়েছে। 'যবনীজার শব্দটি বদলে 'ধর্মভ্রষ্ট' প্রয়োগ করার পেছনে কোন্ উদ্দেশ্য কাজ করছে জানি না। যদি শিশুমনে সাম্প্রদায়িকতার বোধ অথবা মুসলমান সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা না জন্মায় এরূপ ভাবনা থেকে থাকে ; তাহলে বলা যায় সে ভাবনা সম্পূর্ণ ভুল ও ক্ষতিকারক। প্রথমতঃ মতিবিবি অথবা লুৎফ-উন্নিসাএখানে 'পদ্মাবতী' নয়। সে ধর্মান্তরিত হয়েছে। ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ক হয়েছে। তাকে প্রাসঙ্গিকতায় চিনিয়ে দেবার জন্যেই লেখক 'যবনীজার' শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গাহুযায়ী ভাষার ব্যবহার সকল লেখক পারেন না। যাঁরা সফল তাঁরা নিঃসন্দেহে জাত লেখক। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে জাত লেখক। সম্পাদক 'ধর্মভ্রষ্ট' পরিবর্ত শব্দ রূপে ব্যবহার করে ভাষায় প্রকাশশীলতা ক্ষুণ্ণই করেছেন। তাছাড়া ধর্মচ্যুতি যে অপরাধ এই বোধও সম্পাদকের লেখায় যত স্পষ্ট মূলে তত নয়। ধর্ম সম্বন্ধে ছোটদেরও সংকীর্ণ ক'রে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। ধর্মবোধ মানুষের উন্মেষক পথের স্বতঃস্ফূর্ত একটা বিষয়। তা বলপ্রয়োগে সম্ভব নয়। আবার দেখা যায় 'আনন্দমঠে'র তৃতীয় অঙ্কের নবম পরিচ্ছেদে সন্তান সেনার সঙ্গে ইংরেজ সেনার যুদ্ধের নিম্নলিখিতবর্ণনাটি সম্পাদিত ছোটদের সংস্করণে বর্জিত হয়েছে।

"সেই শব্দে বিশাল কানন কম্পিত করিয়া প্রতিধ্বনিত হইল, 'গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।' নদীর বাঁকে বাঁকে ফিরিয়া সেই ধ্বনি দূরস্থ আকাশপ্রান্ত হইতে প্রতিক্ষিপ্ত হইল, গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্।' নদীপারে দূরস্থ কাননান্তরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই ধ্বনি আবার ডাকিতে লাগিল 'গুড়ুম্ গুড়ুম্ গুম্

অথবা, প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে কল্যাণী যেখানে তার শিশু-কন্যা-সহ দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল তার বর্ণনায় নিম্নলিখিত অধরেখাঙ্কিত অংশটুকু বর্জিত হয়েছে ছোটদের অংশে।

"তখন সকলে লোলুপ হইয়া যেখানে কল্যাণী কন্যা লইয়া শুইয়া ছিল, সেই দিকে চাহিয়া দেখিল যে, সে স্থান শূন্য। কন্যাও নাই, মাতাও নাই। দস্যুদিগের বিবাদের সময় সুযোগ দেখিয়া, কল্যাণী কন্যা কোলে করিয়া, কন্যার মুখে স্তনটি দিয়া, বনমধ্যে পলাইয়াছে।"

লক্ষ্য করার বিষয়, তৃতীয় অঙ্কের যুদ্ধের বর্ণনাটুকু ছোটদের অংশে বর্জিত হয়েছে। কেন? এই বর্জনের কোন সঙ্গত হেতু নেই। ছোটরা স্বভাবতঃই adventure এবং thrill ভালবাসে। যুদ্ধ, মারামারি, রোমাঞ্চকর ঘটনা তাদের অতি প্রিয়। অথচ, 'আনন্দমঠে'র সেইটুকু বাহুল্যবোধে ছোটদের জানানো হল না। এ অংশে শিশুর অপরিণত মানসিকতার পক্ষে আপত্তিজনক অথবা কঠিন কোন বিষয় ছিল না। পক্ষান্তরে প্রথম অঙ্কের উদ্ধৃত বর্ণনায় 'স্তন' শব্দটি ছোটদের সামনে ব্যবহার করতে সম্পাদকের দ্বিধা ছিল দেখা যাচ্ছে। সম্পর্কিত অংশটি বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম্পাদক এটুকু গভীরভাবে চিন্তা করেননি যে মাতৃ-স্তনো পুষ্ট শিশুর নিকট 'কোলের শিশু-কন্যার মুখে মাতৃস্তনের চিত্রটি কখনোই শৃঙ্গাররসাত্মক হয়ে ওঠে না। এ চিত্র রমণী-দেহ-সৌন্দর্যের চিত্র নয়। মায়ের কোলে শিশুর পবিত্রতম চিত্র। পৃথিবীর বড় বড় শিল্পী ও সাহিত্যিকের সৃষ্টিতে যা শাশ্বতকাল ধরে রক্ষিত

হয়ে আসছে। বঙ্কিমের এই বর্ণনার মধ্যে Lady Macbeth-এর উক্তির সেই বীভৎস নিষ্ঠুরতাও নেই

লক্ষ্য করার বিষয় Shakespeare-এর নাটকের গল্পগুলি Charls Lamb ও Mary Lamb সম্পাদিত Tales from Shakespeare বইটিতে এই অংশটি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে।

"And with the valour of her tongue she so chastined his sluggish resolutions, that he owe more summoned up courage."

শিশুর মনে ভয় সৃষ্টি হয়, এমন কোন বিষয় শিশু-সাহিত্যের অন্তর্গত হওয়া উচিত নয়। Lady Macbeth-এর উক্ত কথায় শিশু-মনে কেবল ভয়ই জন্মায় না, এক বীভৎস-রসের সঞ্চারও করতে পারে। যার ফলশ্রুতি অতি মাত্রাত্মক হ'তে পারে। মা ও শিশুর অমল-মধুর সম্পর্কের পরিবর্তে মা সম্বন্ধে শিশুর ঘৃণা, ভয়, মনোবিকারও হ'তে পারে। বলা বাহুল্য 'আনন্দমঠে'র সম্পাদনার ক্ষেত্রে এরূপ সমস্যা ছিল না সম্পাদকের অতি সচেতনতা অথবা ছোটদের সংস্করণ করার নির্দিষ্ট কোন আদর্শ, নীতি মেনে না চলার ফলে এরূপ হয়েছে। একজন শিশু-সাহিত্যিককে মনে রাখা দরকার যে—

"……We must understand that what we are doing is not 'managing a zoddler' but 'bringing up a child' to be an adult. As we have seen, our handling now will determine the future. The three-year-old who is out of hand will never 'settle down.' Soul would never have thrown a javelin at his son if he had not harboured an evil spirit in his bosom for years. It is our task to help the child to proune his own imperious will so that it may make the sturdy growth of adult character, not to uproot it so that he is left defence against every wind that blows." ৬

এই কারণেই Malcon, Macduff কে নিজের চরিত্র সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন তা যথেষ্ট শৃঙ্গার রসাত্মক বলে ছোটদের সংস্করণে তা সম্পূর্ণ বর্জন করা হয়েছিল। আর ঠিক এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ'র ছোটদের সংস্করণই হওয়া অনুচিত। দুঃখের বিষয়, এ সম্বন্ধে বাংলার শিশু-সাহিত্যিকেরা সম্পূর্ণ উদাসীন। ফলে, 'বিষবৃক্ষে'র মত জটিল উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বালক-বালিকা, তরুণ-তরুণীর পাঠ্য রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। আমাদের যে মহৎ কর্তব্য শিশুকে আগামী দিনের সুস্থ মানুষ রূপে গড়া তোলা তা' যে অনেকখানিই এই শিশু-সাহিত্যিকদের হাতে সেকথা ভুললে চলবে না। শিশু-সাহিত্য যে জাতির অগ্রগতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সোপান সে সত্যটি আমরা এখনো উপলব্ধি করতে পারিনি। সম্পাদক এবং প্রকাশক, ব্যবসায়-বুদ্ধির তাগিদে নির্বিবাদে জাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছেন। সাহিত্যের নামে শিশুর মানসিক খাদ্যে যে কী পরিমাণ ভেজাল এবং রোগ-জীবাণুর অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার হিসাব নেই। একটি সভ্য দেশে শিশু ও শিশু-সাহিত্য নিয়ে এই ব্যবসায় ও উদাসীন দৃষ্টি কল্পনীয় অথচ শিশু ও তৎসম্পর্কীয় সাহিত্য জাতির জীবনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সব চেয়ে বেশী যত্ন ও সতর্ক-দৃষ্টি এখানেই দরকার। ছোটদের সংস্করণগুলি যথাযথ হলে এগুলি শিশুদের মানসিক-পুষ্টির বড় উপকরণ হ'তে

পারত। বাংলা সাহিত্যেও তার উৎসের অভাবও নেই। কিন্তু অভাব ছোটদের জন্যে উপযুক্ত ক'রে তোলার শিল্প জ্ঞানের। এবং যথেষ্ট পরিতাপের বিষয় হলেও একথা সত্য যে বাংলা শিশু-সাহিত্যে প্রকৃত শিশুপাঠ্য ছোটদের সংস্করণের সংখ্যা অতি অল্পই আছে। তবু আশার কথা এরই মধ্যে দু' একখানি ছোটদের সংস্করণ সবদিক থেকেই আদর্শ গ্রন্থ রূপে বিবেচনার যোগ্য। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী'র ছোটদের সংস্করণ দুটি 'ছোটদের পথের পাঁচালী (১৯৪৪ সং) এবং 'আম আঁটির ভেঁপু' (১৯৫১ সিগনেট সংস্করণ) এবং 'আরণ্যকে'র শিশু সংস্করণ 'ছেলেদের আরণ্যক' (১৯৪৭) এক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য মূল গ্রন্থ দুটির বিষয়বস্তুও এই সাফল্যের একটি বড় কারণ। একদিকে দুর্গা-অপু ও তাদের সঙ্গী সাথী পরিবেষ্টিত নিশ্চিন্দপুরের গ্রামীণ প্রাকৃতিক পরিবেশ অন্যত্র নাঢ়া ও লবটুলিয়ার আরণ্যক সৌন্দর্য উভয় ক্ষেত্রেই শিশুর অপার কৌতূহলের সামগ্রী থরে বিথরে সজ্জিত। অপু, দুর্গা, লীলা, নীলা, রাণী, পটু, পটলিরা সকলেই কিশোর-কিশোরী, দুরন্ত চঞ্চল প্রাণ। কিন্তু প্রয়োজনে সেখানেও লেখক সম্পাদক কত সংযমের পরিচয় দিয়েছেন।

পরদিন উঠিয়া সে চোখ মুছিতেছে, কড়ুনীর মা দাই বলিল, "ও খুকি, কাল রাত্তিরে তোমার একটা ভাই হয়েছে, দেখবে না ? ওমা, কাল রাত্তিরে এত চেঁচামেচি, এত কাণ্ড হয়ে গেল, কোথায় ছিলে তুমি ?" এক দৌড়ে ছুটিল আঁতুর ঘরের দুয়ারে গিয়া উঁকি মারিল। তাহার মা আঁতুড়ের খেজুর পাতার বেড়ার গা ঘেঁষিয়া শুইয়া ঘুমাইতেছে। একটি টুকটুকে অসম্ভব রকমের ছোট্ট, প্রায় একটা কাঁচের বড় পুতুলের চেয়ে কিছু বড় জীব কাঁথার মধ্যে শুইয়া—সেটিও ঘুমাইতেছে। গুলের আগুনের মন্দ মন্দ ধোঁয়ায় ভাল দেখা যায় না। সে খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতেই জীবটা চোখ মেলিয়া মিটমিট করিয়া চাহিয়া অসম্ভব রকমের ছোট্ট হাত দুটি নাড়িয়া নিতান্ত দুর্বল ভাবে ঈষৎ ক্ষীণ সুরে কাঁদিয়া উঠিল। হঠাৎ অসহায় অসম্ভব রকমের ছোট্ট, নিতান্ত ভাইটির জন্য দুঃখে, মমতায়, সহানুভূতিতে খুকীর মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।"

এই ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ 'খুকী'র মানসিক অবস্থার বর্ণনায় লেখক একটু অসতর্ক হলেই এই নির্মল সৌন্দর্য বিনষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু তার মাত্রাবোধ অসাধারণ; বিষয়টি মাধুর্যে ভরে উঠেছে। যত্নে, সতর্কতায় পরিমিতি বোধে ছোটদের সংস্করণ গ্রন্থগুলিও শিশু-সাহিত্য রূপে কত মূল্যবান হতে পারে এ গ্রন্থ তারই একটি আশ্চর্য উদাহরণ।

উৎস পরিচিতি :

১। রবীন্দ্রনাথ, সমাপ্তি (১৮৯৩), গল্পগুচ্ছ (অখণ্ড, ১৩৬১), ২০৭-৮ ২। তদেব, বিশ্বপরিচয় (১৩৩৭) র. র. চ. বিং সং (২৫ খণ্ড), ৩৫১ ৩। Carroll, Lewis, Allic's advetures in wonderland, N. r. (1865), Preface, XIV-V. ৪। বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত আনন্দমঠ (৬ সংস্করণ, ১৩৪৭), ভূমিকা ১-৩ ৫. Caroline,:B., Zachry, Understanding the Child, London (Undated), 291. ৬। Hostler, Phyllis, The Child's World, U. K. 1953 : 1959), 120, 137.

গাজীনামা

সোমেন্দ্রনাথ বসু

গাজীনামার নায়ক হচ্ছেন সমসের গাজী। ত্রিপুরার ইতিহাসে তাঁকে 'সমসের ডাকাইত' বলে উল্লেখ করা আছে। তিনি যেমন হঠাৎ গজিয়ে উঠলেন তেমনি হঠাৎ মিলিয়ে গেলেন। তাঁর জীবনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু। কবির নাম সেখ মনুহর। কবি গ্রাম্যলোক হলেও ভাষা গ্রাম্য নয় বেশ চাতুর্য আছে ভাষায়। মুসলমানী শব্দের বহুল প্রয়োগ স্থানে স্থানে দুর্বোধ্যতার সৃষ্টি করেছে। আখ্যানকারী হিসাবে গাজীনামা চিত্তাকর্ষক। যুদ্ধ বিগ্রহ, ঘাত প্রতিঘাত, ষড়যন্ত্র চক্রান্তের মধ্য দিয়ে গল্প চলে যায় দ্রুতগতিতে-আখ্যায়িকা জমে ওঠে, গাজীর মৃত্যুতে যার পরিসমাপ্তি।

গাজীনামার কাল—গাজীনামার প্রাচীনতা নির্ণয় করতে গিয়ে 'রাজমালা'-সম্পাদক শ্রীকালীপ্রসন্ন সেনগুপ্ত অতি উৎসাহ বশতঃ বলেছেন "সম্ভবতঃ ইহা আড়াইশ' বছরের প্রাচীন গ্রন্থ।" বলা বাহুল্য এই উক্তির পক্ষে যে কোন যুক্তি নেই তাই বলাই যথেষ্ট নয়, এর বিরুদ্ধের যুক্তি এত প্রবল যে এর কোন অর্থই খুঁজে পাওয়া যায় না। কাব্যের মধ্যে সমসের গাজীর মুর্শিদাবাদ যাবার তারিখ অতি স্পষ্টভাষায় আছে; তা হলো—

এগারস উনসৈট্য সনের জৈষ্ঠ্যমাসে।
জুমাহা বারেতে জান জোহরের সেগে ॥
উন্তিসা তারিখ সেই ছিল শুক্রবার।

অর্থাৎ সমসের গাজীর কালই আজ থেকে দুশো আটবছর আগে। তারপর, কবির পিতামহ সমসেরের সমসাময়িক। কারণ তাঁর গল্প শুনেই সেখ মনুহর কাব্য লিখেছেন—

কহে সেখ মনুহরে পাঞ্চালি রচিয়া।
পীতামোহ মুখে বাক্য সকল শুনিয়া ॥

১৭৫১ খৃঃ যদি গাজীর মুর্শিদাবাদ যাত্রার সময় হয় তবে তার থেকে পিতামহ-পৌত্রের ব্যবধানে তিরিশ বছর সময় দিলেও এ কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের আগে যায়না। ইতিহাসের সাক্ষ্যেই তা অসম্ভব।

কবির পরিচয়...কবি সেখ মনুহর 'নিজ করছি' বিবরণ দিয়েছেন। পিতৃকুল মাতৃকুলের সুবিস্তৃত পরিচয় তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। তাঁদের আদিবাস ছিল ভুলুয়ায়। তার উর্দ্ধতন ষষ্ঠপুরুষের নাম সাহা মহম্মদ। তাঁর পৌত্র সেক গাজি ভুলুয়া ছেড়ে দক্ষিণশিকে এসে বাস করতে থাকেন। আত্মবিবরণের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে মাতার নাম পদবানু। পিতামহের নাম আছে, পিতার উল্লেখ আছে নাম নেই। ষষ্ঠপুরুষ উর্দ্ধতনের বর্ণনায় বলছেন—

সাহা মহম্মদ নাম।
ছিল তালুকদারি কাম।

তাঁর পুত্র— তাহান নন্দনবর

এ'র নাম রমজান। রূপে গুণে পঞ্চশ'র

রমজানের পুত্র সেক গাজি—

তাহান পুত্র সেক গাজী। ছরিয়া ভূলুয়া দেষ।
আল্যাতালা ছিল রাজী।। দক্ষিণ সিক প্রবেষ।
আসাপূর্ণ পুরিল কৈল্যান থানা কৈলাপাড়ুয়া মোকাম।

সেক গাজির পুত্র জান মোহম্মদ—

তান পুত্র গুনালএ
জান মহাম্মদ হএ
ধানে ধনে পুণ্য অনুপাম।

তাঁর দুই পুত্র সাদক আর নাছির। সাদক কবির পিতামহ। সাদকের কনিষ্ঠ পুত্র—'নৃপতির নাম ধরে সবে জানি মোর পীতবর।" এ থেকে ধরা যেতে পারে যে তাঁর পিতার নাম ছিল সমসের। হুগলী জেলার আদিবাসিন্দা ছিল তাঁর মাতৃকুল। তাঁরাও ঘটনাচক্রে এসে পড়লেন দক্ষিণাসিক। মাতৃকুলেরও পাঁচপুরুষের বৃত্তান্ত আছে।

ভণিতা—গ্রাম্যকবি হলেও সেখ মনুহর যে একেবারে অশিক্ষিত ছিলেন না তা তো তাঁর কাব্যই প্রমাণ কচ্ছে'। তিনি যে অন্যান্য কাব্য পাঠ করেছিলেন তার প্রমাণ তাঁর ভণিতাগুলির বৈচিত্র্য। নানা ধরণের ভণিতায় সমসের গাজীর প্রতি তাঁর ভক্তি স্পষ্ট বোঝা যায়। কয়েকটি ভণিতা তুলে দিচ্ছি—

১। সেখ মনুহর ভণে আমীর নন্দন
সমসের গাজীর কথা অপূর্ব কথন।।
২। মাতাপিতা গুরু পীর করিয়া প্রণাম।
কহে সেখ মনুহরে গাজি মনকাম।।
৩। সেখ মনুহরে ভূণে গাজির বিজএ।

শেষ ভণিতাটি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ

ছৈয়দ মন্দি পীর মির মর্য্যাদাসাগর। সে তিন চরণে করি ভক্তি নিবেদন।।
ছৈয়দ হাচন খেনর্কা'র (খোন্দিকার ?) কৃপার লাহর সেক মনুহরে কহে পাঞ্চালি সুরষ
মহাম্মদ সরিপ হাজি কালের নন্দন। গাজির নামা পুস্তকে হেন মধুরষ।।

কাব্যের নাম—দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বঙ্গসাহিত্য পরিচয় 'সমসের গাজির গান' নাম দিয়ে আলোচনা করেছেন এই পুঁথির। উপরিউক্ত ভণিতা থেকে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে গ্রন্থের নাম গাজি নামা।

১৮৯৩ খৃঃ মৌলবী ঘবির এই কাব্য ছেপেছিলেন। 'বাংলা ইতিহাসাশ্রিত কবিতায়' সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কথা বলছেন। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেছেন শ্রীলুৎফুল চট্টগ্রাম থেকে ঐ পুঁথি প্রকাশ করেন, তাতে গ্রন্থকারের নাম নেই। তিনি নাকি গাজির সমসাময়িক ব্যক্তি। বলাবাহুল্য এ তথ্য ঠিক নয় তা আমাদের পূর্ব আলোচনা প্রমাণ কচ্ছে। ১৮১৩ অবশ্যই

১৯১৩ হবে।

ঐতিহাসিক পটভূমিকা—মহারাজ ইন্দ্রমাণিক্যের রাজত্বকালে ত্রিপুরার রাজনৈতিক আকাশে সমসের গাজীর আকস্মিক অভ্যুদয়। অদম্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর দৈবপ্রেরণা সমসেরকে বড় করেছিল এই কথা আজ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে। তার সঙ্গে যুদ্ধে বারবার ইন্দ্রমাণিক্যের পরাজয় ঘটেছে। কিন্তু ত্রিপুরার লোক ইন্দ্রমাণিক্য ছাড়া আর কাউকে রাজা বলে মানতে রাজী হলোনা। তখন চতুর সমসের উদয়মাণিক্যের ভ্রাতুষ্পুত্র বনমালী ঠাকুরকে লক্ষণ মাণিক্য নাম দিয়ে রাজা সাজিয়ে রাজত্ব চালাতে লাগলেন। লক্ষণ মাণিক্য বেশী দিন বাঁচলেন না। ওদিকে যুবরাজ কৃষ্ণমণি মাঝে মাঝে সৈন্য সামন্ত যোগাড় করে সমসেরের বিরুদ্ধে লাগবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কিছুই সুবিধা হয় না। অবশেষে মীরকাশেম নবাব হয়ে কৃষ্ণমণিকে 'ত্রিপুরেশ্বর' বলে স্বীকার করলেন। সমসেরকে ধরে নিয়ে গিয়ে বধ করা হল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ সমসেরের কাল।

গাজীনামা কাব্যের একদা বহুল প্রচলন ছিল। ফলে লোক মুখে কথিত হতে হতে এর বিষয়বস্তু কোথাও কোথাও অন্যরূপ ধরেছে। গাজীনামার বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রচলিত লোকপ্রবাদের অমিল কোথাও কোথাও আছে। কোন কোন সমালোচক সেই লোকপ্রবাদকে গাজীনামার বিষয়বস্তু বলে মনে করেছেন।

সমসের গাজীর বিবাহ সম্বন্ধে শোনা গেছে যে তিনি তাঁর পালক নাছির মহম্মদের কন্যা দৈয়া বিবিকে বিয়ে করেন। বলাবাহুল্য এটা নিছক লোকপ্রবাদ। গাজীনামার কাহিনী ভিন্ন। নাছির কন্যা দৈয়াবিবিকে বিয়ে করতে চাইলে গাজীর সঙ্গে নাছিরের ঘোর যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধকালে দৈয়াবিবি আগুনে আত্মহত্যা করে প্রাণত্যাগ করেন।

সমসেরের মৃত্যু সম্বন্ধে কেউ কেউ লিখেছেন যে তাঁর দস্যুতার সংবাদে উত্যক্ত হয়ে মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁকে বন্দী করার আদেশ দেন। এবং তাঁকে বন্দী করে এনে মুর্শিদাবাদে তোপের মুখে উড়িয়ে দেওয়া হয়। এ কাহিনীও গাজীনামার মতে সত্য নয়। কারণ সেখানে বলা হচ্ছে মুর্শিদাবাদের রাজার সঙ্গে গাজীর বন্ধুত্বই ছিল এবং তিনি গাজীকে সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে ছিলেন মুর্শিদাবাদে। তাঁর এক অনুচর গাজীকে গোপনে হত্যা করে।

উপরিউক্ত সংবাদ দুটির বিভিন্ন প্রচলনের মধ্যে কোনটি সত্য তার মীমাংসা করা সহজ নয়। তবে গাজীনামার বক্তব্য গাজীর কালের নিকটতর এবং সেই হিসাবে অধিকতর বিশ্বাস্য। নাছির মহম্মদ নামে এক জমিদার তাঁর নিজের দুই পুত্রের সঙ্গে সমসের গাজীকেও পালন করেছিলেন। জমিদার পুত্রদের চেয়ে গাজীর পড়াশুনা ভাল হতে লাগলো তার এই বিদ্যাশিক্ষার সাফল্যের কথায় বলা হচ্ছে যে

লেখাপড়া গুনবন্ত পিয়ের নন্দন।
দেখি গুরু হইলেক সানন্দিত মন।।
জমিদার দুই পুত্র না হও সমান।

একদিন মাঠে খোলা ঠাণ্ডা বাতাসে গাজী শুনেছিল। এমন সময় ঘুম এলো, ঘুমের মধ্যে দেখলো স্বপ্ন। ইতিমধ্যে মাঠে ভীষণাকার সর্পে'র আবির্ভাব। রাখালেরা ছুটে গিয়ে খবর দিল জমিদারকে।

জমিদার তার পোষা কুকুর নিয়ে ছুটে এলো মাঠে। কুকুরের চীৎকার আর লোকজনের ডাকে ঘুম ভাঙলো গাজীর। তখন গাজী স্বপ্নের বর্ণনা দিলে

মোর হস্তে ধরিএক থর্গ তিয়বার   দেখিলুম মোহাতরা ছায়াতে বসিলুম।
গজের আম্বারি ভ্রমিত বনবেহার ॥   ভাঙ্গিয়া পরিল বৃক্ষ মনে ভএ পাইলুম ॥
খড়গের চমক আর করের পাচনে।   আরবার বটবৃক্ষ নতুন প্রলব।
ভুবন জিনিতে পারে হেন লও মনে।;   ছবজা রঙ্গ ভাল সব পত্র অসম্বব ॥

জমিদার তখন স্বপ্ন গণাইতে আনে শ্রীধর দ্বিজবর।" শ্রীধর স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে বললেন—

গজকান্দে চরে যেবা স্বপ্নের মাজার।   জে সকলে স্বপ্নে দেখে বৃক্ষ ছাআগতি।
অবুর্ব প্রদিষ্টা করে সংসারে তাহার ॥   সে সকল হএ যান রাজা মহামতি ॥
যে সকলে স্বপ্নে পাএ থর্গ থরসান।   নতুন পল'ব সাকা দেখে যেইজন।
তাহার নামের দঙ্গা বাজে স্থানে স্থান ॥   অবর্শ্য হইব সেই রাজ্যের ভাজন ॥

স্বপ্নের বিশ্লেষণ শুনে গাজী মনে খুশী হলেন এবং জমিদার ক্রুদ্ধ হলেন।

এরই কিছুদিন পরে গাজী হোসেন খন্দকার নামে এক পীরের কৃপাদৃষ্টি পড়লো গাজীর ওপর গাজী খুব ভক্তি গদগদভাবে পীরকে হাজার টঙ্কা নজরাণা দিলেন। পীর গাজীকে যে আশীর্বাদ দিলেন তার ধরণ অনেকটা ম্যাকবেথের ডাইনীদের মত। বল্লেন তোমায় দৈব অশ্ব দিলুম এর দৌলতে তুমি রাজা হবে।

পীরে বোলে মন দিয়া স্থন পীর স্থত।   নাছির যাইব মারা পাইব জমিদারি।
এ স্থভর্ণ ঘোড়ার জান কির্মতে বহুত ॥   রাজাবংস ভঙ্গ হৈব হৈবা অধিকারি ॥
রসাঙ্গে মগদরাজা ধার্মিক আছিল   কিন্তু রাজার সঙ্গে তোমার হৈব মহারণ।
চৌদ ছোলতান প্রতি এই দৈর্ব দিল ॥   আল্লাএ করিবে হৈবা রাজ্যের ভাজন ॥
ছোলতানে বকসাইল আপন পেটারে।   এই স্থভর্ণ অশ্ব তোমা দিলুম কারণ।
তা ক্রর্মে আসিয়া ঠেকিল মোর করে ॥   মুল্লুক বিজয়ে হৈব জানিয়া আপন ॥
তাহান বংসের আমি ক্ষুদ্রতা যে বিন্দু।   গাজিএ বলিলা পীর কতেক বৎর্ষর।
তপন ভুবন মাঝে সাগরের ইন্দু ॥   পীরে বোলে পঞ্চবিংস জানিঅ সর্ত্যর ।।

গাজীর সন্তুষ্ট চিত্তে ধীরে ধীরে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে উঠতে লাগল। গাজীর ভাই ছাহ্ (সাহ্ ?) অমিত শক্তিশালী। তার সঙ্গে গাজীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এই সময় থেকে দেখানো হয়েছে। গাজীর ধারণা যে জমিদার নাছির মহম্মদ যখন পিতৃতুল্য স্নেহে আমায় পালন করেছে তখন "পুত্র হোতেধিক দয়া করিব আমারে।" গাজী নাছির কন্যা দৈয়াবিবিকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালে। এই প্রস্তাব শুনে নাছিরের অবস্থা 'খেপিলে কুম্ভীর যেন না রহস্ত জালে।' নাছির হুকুম দিলে গাজীকে এখনি বেঁধে আন। শুনে ছাহুর সঙ্গে পরামর্শ করে গাজী বেদরাবাদে পালাল। কচুয়ার ভৌমিক নূর মহম্মদ তার সহায় হলেন। গাজীকে ধরবার জন্যে নাছিরের সৈন্যরা মাঝে মাঝে চেষ্টা করে কিন্তু ছাহুর বিক্রমে পারে না—'না পারে ছাহুর লাগি গাজি মারিবারে।' সমসের আর ছাহু

আবার পীরের কাছে জানতে গেল তাদের বরাতে কি আছে। পীর বললেন ভরসা দিয়ে

রোসনাবাদ অবুর্ব হইব তেরা বষ ।।
রাজ্যগোত্র ভঙ্গ হইব পাইব রাজধানী।
না রৈব এতাতে জমিদারের নিসানি ॥

তখন ছাহ্ আর গাজী যুক্তি করতে বসলো—ছাহ্ বললে নাছিরকে হত্যা করে ফেলাই ভাল। গাজী অতটা অকৃতজ্ঞ হতে রাজী হলোনা।

গাজী বলিল হেন না শোভে বচন।
পালাকত্যা বধিলে কুফিপ নিরঞ্জন ॥

ছাহ্ শুনলোনা গাজী যখন নিদ্রামগ্ন তখন গিয়ে বধ করলে নাছিরকে। গাজী খবর পেয়ে এলো। "বহুস সন্তাপে গাজী করিল রোদন।" গাজীর এই কাজে ক্রুদ্ধ হয়ে নাছির পুত্রেরা যুদ্ধের আয়োজন করতে লাগলো। যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়েও গাজী নাছির-পুত্রদের বললে "মোরে ভগ্নি বিবাহ দিআ রাখহ পরাণ" তুমুল যুদ্ধ হলো, যুদ্ধে নাছির পুত্রেরা মরলো।

দেআ বিবি দেখি হেন মনে দুক্ষ গুণি।
আনলে দহিয়া মৈল সোগে দুক্ষে পুনি ।।

জয়লাভ করে বল্লভপুরে গাজী এক বাড়ী বানালে, জমিদারের প্রজাদের বল্লে—

তুমি সবে দেয় যদি খরচ রসদ   ধনে প্রাণে তোমারে পুজিস্থ বারে বার ।।
সর্ব দিন থাকে যদি মোহর মদদ ।।   জেগতি আমার হএ সেগতি তোমার।
সর্বে অঙ্গিকার আর কৈলজে তোমার।   কোন সন্দ না করিয় মনেতে তোমার ॥

এদিকে নাছিরের বিশ্বস্ত কর্মচারী রতন চৌধুরী গেল উদয়পুরে। গিয়ে রাজার কাছে কেঁদে পড়ে বললে—সামসের ডাকাইত এক ছাহুয় পলবান।

নাছির মোহম্মদ মারি দিল অপমান ॥

রাজা উজিরকে ডেকে তখনি বল্লেন সৈন্য পাঠাও সমসেরকে ধরে আনুক। এদিকে রাজার উজির আসছে শুনে সমসের তো ভয়ে কাঁপতে লাগলো। যাইহোক দক্ষিণসিকের লোকেরা কিন্তু সমসেরের পক্ষে রইল। যখন রাজার সৈন্যদল এসে পৌছাল সমসের প্রথমে যুদ্ধ না করে লুকিয়ে ছিল পরে একদিন গভীর রাত্রে উজিরকেই অপহরণ করে নিয়ে এল। পরদিন প্রভাতে ত্রিপুর সৈন্যরা সমসেরের বাড়ী ঘেরাও করলে। শত্রুসংখ্যার আধিক্য দেখে গাজী আর ছাহ্ বুঝলে পরাজয় নিশ্চিত। তখন গাজী আর ছাহুর মাথায় অভিনব বুদ্ধি খেলে গেল। উচ্চ গৃহের উপরে উজিরকে বেঁধে রাখলে যাতে শত্রুপক্ষের গুলি বা তীর তার গায়ে এসে লাগে। তখন প্রাণভয়ে

উজির ডাকিয়া বোলে স্থন বিরগণ।   জথ বান মার সবে মোহকে বিন্ধিব।
তুমি সবে না করিয় বান বরিসন ॥   নতুবা গাজীএ মোরে কাটিয়া পারিব।

ত্রিপুর সৈন্যরা উজিরের এই দশা দেখে রণে ভঙ্গ দিল। গাজী তখন উজিরকে খুব খাতির যত্ন করলে কিন্তু উজির মুক্তি চাইতে

গাজিএ বলিলা মোর সনদ আনাও।

মোকে জমিদারী দিয়া তুমি চলি যাও ॥

উজির রাজাকে চিঠি লিখলে যে জমিদারী না দিলে গাজী ছাড়বে না এবং যদি তাড়াতাড়ি চিঠি না দাও তবে – লুটী নিব রোসানাবাদ বধিব তোমারে ॥

বড়হি বিক্রম ধরে দুই গুণবন্ত ॥
রাজধানি ননাহি দেখি হেন বিরয়ন্ত ॥

রাজা তো চিঠি পেয়ে খেপেই আগুন। রাজার এই ক্ষিপ্ততার বিবরন সেও মনুহর বেশ জমিয়ে তুলেছেন

দন্ত পরে দন্ত ভিড়ি দন্তে দন্তে কড়মড়ি
কর্ণে যেন ফুটীলেক শাল।
জেন প্রজ্জলিত ভানু ফণি বিসে ডংসে তণু
জেন মর্মে ভেদি গেল ছেল।

রাজা যুদ্ধে যাবেন বলে যখন মনস্থির করেছেন তখন দেওয়ান বল্লে আগে উজিরকে মুক্ত না করে যুদ্ধে যাওয়াটা কিছু কাজের কথা নয়। অবশেষে সকলের সেই একই পরামর্শে রাজা যুদ্ধে যাত্রা স্থগিত করে গাজীকে সনদ পাঠালেন। উজির সেই সনদ দক্ষিণসিকের লোকেদের পড়ে শুনালেন। গাজী সরকারীভাবে স্বীকৃত জমিদার হলেন। সেক মুনহর এই প্রসঙ্গে গাজীর রূপবর্ণনা করেছেন

বলে মহা বলবন্ত রূপে পঞ্চবাণ বচন অমিয়া ভাষ ক্রমে সুধাপান
চলিতে গম্ভীর জানে রাজা অনুমান ॥ বসান ভূষণ গাত্র দিব্য দিপ্তিমান ॥

কিন্তু শান্ত সৎবুদ্ধির লোক গাজী নয়। রাজার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সে ভাবতে লাগল কেমন করে রাজার খাজনা ফাঁকি দেওয়া যায়। রাজদরবারে তার পক্ষের লোক যে না ছিল তা নয়। তাদের সাহায্যে তিন বছরের খাজনা তো দিলেই না উপরন্তু মেহারকুলের ইজারাও নিলে।

গাজীর বেয়াদপি যখন এমনি করে বাড়তে লাগলো তখন নাছির মহম্মদের কর্মচারী রতন আবার এসে বললে যে গাজি

নানা অস্ত্রে সাজিয়াছে বন্দুক কামান।
রোসনাবাদ মারিবারে করে অনুমান ॥

রাজা তখন বিপুল সেনাদল সাজিয়ে যুদ্ধে যাত্রা করলেন। রাজসৈন্য দক্ষিণসিকে গিয়ে লুটপাট করতে লাগলো। উজির গাজীর কাছে চিঠি পাঠালে যে শীগগীর খাজনা মেটাও। গাজীও চোটপাট করে উত্তর দিলে, যে যদি চটপট উদয়পুর ফিরে না যাও তবে তাহলে বিপদ ঘটাবো। বিষম যুদ্ধ শুরু হলো। রাজ-সেনাপতিরা প্রাণপণে লড়লে। মনুহর সে যুদ্ধের খুব বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। অবশেষে দৈব-শক্তির প্রভাব গাজীর পক্ষে দেখা গেল। রাজার কামানে আগুন লাগানো মাত্র তা ফেটে গেল। ওদিকে গাজীর কামান রাজ-সৈন্যদল বিনাশ করতে লাগলো।

তোপে অগ্নি দিল গীয়া তিরন্দাজগণ। কতজন খালাসির উড়াইব সির।
জানিল সব সে গাজী হইব নিধন ॥ হেনকালে তোপ ছাড়ে গাজী দিগবির ॥
সে কবিব নিরঞ্জনে কভু নহে আন। হুহুঙ্কার শব্দ গোলা হইল বাহির।
ধমকে কামান ভাঙ্গি হৈল খান খান রাজার দল বহু সৈন্য উরাইল সির ॥

রাজা সৈন্য দল পিছু হটে গেল মহেশ পুষ্করণীর পাড়ে। সেখানেও তাদের পরাজয় হলো।

'সুসার হইল জদি রাজ সৈন্যগণ।
বিলাপেন্ত মোহারাজা হহিয়া মরম ॥

যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা ইন্দ্রমাণিক্য শোকে বিলাপ করতে লাগলেন। রাজার অবস্থা কাহিল বুঝে গাজী উদয়পুর আক্রমণ করলো। সাতদিন ধরে যুদ্ধ চললো। গাজী জিততে পারে না। উদয়পুরে এক মতাইঠাকুরাণীর পূজা দিতেন মোহারাজা। যুদ্ধের হিড়িকে সে পূজা বন্ধ। মতাই পূজা না পেয়ে ক্রুদ্ধ।

গাজির সিয়রে আসি সপ্ন দেখাইল ॥
শুননি সমসের গাজি চিননি আমারে।
বর দিতে আইলাম তোরে দুবে বাঙ্গালারে ॥
মতাই ঠাকুরানি আমি দেব চিহ্ন কা এ।
নিদ্রা ছাড়ি উঠ যুদ্ধ জিনহ লিলা এ ॥

গাজী ঘুম থেকে উঠেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ধরে এনে মতাই ঠাকুরাণের পূজা দেওয়ালে। তারপর যথারীতি

রাজার দিগে অথ কামান আছিল! গাজির দিগের তোবে হুহুঙ্কার করে।
বিষম সময়ে কামান খণ্ড খণ্ড হৈল ॥ গিরিমুরা উফারন্ত পরে নিরন্তরে ॥

রাজা আগরতলায় পালালেন। সমসের আনন্দিত চিত্তে উদয়পুর লুটপাট করে নিলে। রাজা গেলেন মণিপুর।

রাজাকে তাড়িয়ে গাজী নিজে রাজা না সেজে বনমালী ঠাকুরকে লক্ষণমাণিক্য নাম দিয়ে রাজের সিংহাসনে বসালে। তিনি মাত্র তিন বৎসর জীবিত ছিলেন। ঢাকার দরবারে ভোমন নামে এক গাজীর সঙ্গী গাজীর প্রতিনিধি হয়ে রইল। গাজী বছর বছর নবাবের খাজনা ঠিকমত মেটাতে লাগলো। এই সময় ছাতুর সুন্দরী স্ত্রীকে গাজী বিয়ে করলে।

এত কাণ্ড সত্বেও গাজীর অর্থের লোভ মেটে না। গাজী দলবল নিয়ে চট্টগ্রামের কৃপণ জমিদার মিরাহা চৌধুরীর বাড়ী আক্রমণ করলো। মিরাহী চৌধুরী তার বেগমের সঙ্গে তখন পাশা খেলছে। বাইশটি সিন্দুকে বাইশ লক্ষ ধন ছিল, 'এক লক্ষ ধন ছাড়ুএ গাজীএ লুটিয়া লুটিয়া আনিল।'

গাজী ইতিমধ্যে প্রাসাদ বানিয়েছে, রাজ্যে মোটামুটি শান্তি এনেছে। বেশ খোস মেজাজে গান বাজনা শুনছে। রাজ্যে সুবিচার এসেছে। সেক মনুহর এই সবের সুদীর্ঘ বিবরণ দিয়েছেন, তার থেকে দুচার লাইন তুলে দেওয়া গেল।

লোকের বিচার গাজী করে ভালমতে। জাগির দোহাই পারে নগরে বাজারে।
হকেত বেহক কেহ না পারে করিতে ॥ গজে নাহি মারে লোক ব্যাঘ্রে নাহি ধরে ॥

কিন্তু এই সুখশান্তি ভিতরে ভিতরে আর একজনের মনে বিষক্রিয়া চালাচ্ছে—অবশ্য কারণও ছিল। বেচারা ছাতু বাঘের মত শক্তি দেহে কিন্তু মস্তিষ্কের অল্পতাহেতু গাজীর অনুচর মাত্র। ছাতুর মনের মধ্যে ধিকিয়ে ধিকিয়ে আগুন জ্বলে। মাঝে মাঝে গায়ের জোরে সে গাজীর বিচার উলটে দেয়। ছাতুর প্রথমে অনুনয় বিনয় করলে গাজী সুর চড়িয়ে বল্লে

বিচারের যৈগ্য তুমি নহে কদাচন
কেবল গায়ের বলে বৈল কি কারণ ॥

তখন বসিরের সঙ্গে যুক্তি করে গাজী ছাহুকে হত্যা করলে। ছাহুর বোন গাজীর স্ত্রী। কিছুদিন ছাহুকে না দেখে সে প্রশ্ন করলে "ভাই ছায়েব গেছে কথাএ হইল মাছেক।" গাজি বললে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে ঢাকায় গেছে। মাস ছয়েক পরে গাজীর স্ত্রী যখন জানলে ভাই মারা গেছে তখন কেঁদে কেটে ভাসাতে লাগলো অবশেষে মরেই গেল।

এরপর চট্টগ্রামের দুই মুসলমান প্রধান গাজীর কাছে সুব্যবহার না পেয়ে তাকে গুপ্তহত্যা করার চেষ্টা করলে কিন্তু পারলে না; ইতিমধ্যে গাজী পুনর্বিবাহ করলে এবং এক সুন্দরী হিন্দু কন্যাকে অপহরণ করে ঘরে আনলে।

নিয়মে করিলা গাজী রতিপান সুক।
দুই ধনির মনে হইল বহুল কৌতুক।।

গাজীর কন্যা তহুবিবির বয়স ষোল—রূপ টলমল করছে, যুবক বৃদ্ধের বুক বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে

"ষোল বৎসরের বালীকা পূর্ণসুক।
অচৌক যুবকাবিন্দ বিধরএ বুক।।

ঢাকার নবাব স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়ে তাকে বিয়ে করলে। প্রতিষ্ঠা ও যশের পূর্ণ শিখরে উঠে গাজী সভাসদদের বারণ অস্বীকার করে চলে গেলেন মুর্শিদাবাদে। যাত্রার কাল আগেই বলেছি—এগারশ ঊনষাট সন। যাবার পথে ঢাকায় শ্বশুর জামাতার দেখা হলো। জামাই ও গাজীকে যেতে বারণ করলেন। গাজী শুনলেন না। নবাবের কাছে গাজি সম্বন্ধে নানা খবর পৌঁছেছিল। নবাব গাজীকে জিজ্ঞেস করলেন বিচার 'বিহিনে কার বধিয়াছ প্রাণ।' গাজী বল্লে নানা কথা খুব জোর দিয়ে বল্লে তার রাজ্যে চোর বাটপাড় নেই। শুনে খুশী হয়ে নবাব গাজীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলেন। দশদিন পরে যখন গাজী মুর্শিদাবাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। তখন দরবারে তার শত্রু আগা এসে বল্লে নবাবকে

ভাটির বাগ বন্দি করি এরি দিলা কেনে।
আসিয়া মারিব দেশ সমুদ্রের সনে।।

নবাব তখন গাজীর বন্ধুত্বে মশগুল, ধমক দিয়ে বল্লেন 'আমি জেদা গাজি তেছা জানে সর্বজন। আগা তখন কৌশলে গাজীকে রঙ্গপুরের ঘাটে নিয়ে এল। এক হার্মাদকে নবাব তোপে ওড়াতে আদেশ দিয়েছিলেন। আগা তার বদলে "সমসের গাজীরে নিয়ে বান্দিলেক তোপে।" আগা বাহেরের ছেলে তোপে আগুন দিল, কামানের গোলা গাজীর দিকে ছুটলো না পিছন ছুটলো, আগার পুত্র উড়ে গেল। তখন আগা এক যাদুকর দিয়ে গাজীকে যাদু করলো। পরের বার কামানে আবার গাজীকে বাঁধা হলে-'মোহামন্দ হৈল তোপ ধুমে অন্ধকার।' গাজীর কি হলো? কেউ বলে গাজী তোপে মরেছে, কেউ বলে গাজীকে মক্কামদিনায় দেখা গেছে।

গাজীর মৃত্যু সংবাদে দক্ষিণদিকে কান্নাকাটি পড়ে গেল। সবাই পিতৃশোক অনুভব করতে লাগলো তারপর গাজীর অনুচররা পরস্পর যুদ্ধ মারামারি করলে। তারপর কোম্পানীর রাজত্ব এলো। রাজত্ব এলো। ত্রিপুরার কৃষ্ণচন্দ্রমাণিক্যের শাসন শুরু হলো। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গাজীর দেওয়া নিষ্কর জমির নতুন কর বসালেন। লোকে বল্লে জমিদার নিষ্কর দিলে আর রাজা তাতে কর বসালো।

রাজা লজ্জিত হয়ে সে কর ফিরিয়ে নিলেন। কাব্য হিসাবে 'গাজী নামা' খুব উচুদরের না হলেও মনোযোগ আকর্ষণ করার অনেক গুণ এতে আছে। সেক মন্থুহর গাজীর বিশেষ ভক্ত। হিন্দু দেবীকে পর্যন্ত তিনি গাজীর পূজাভিলাষিণী করেছেন। গাজীর সুশাসনের বর্ণনায় তিনি মুখর। সম্পূর্ণ যথাযথ না হলেও সে বিস্তৃত বর্ণনাগুলি মন্থুহর তাঁর কাব্যে দিয়েছেন তার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যের বীজটুকু আছে এ অনুমান হয়ত খুব অসঙ্গত নয়। বর্ণনাত্মক তিনটি অংশ তুলে এখানে আলোচনা করলে দেখা যাবে যে মন্থুহরের ক্ষমতা ছিল ভাব প্রয়োগের।

গাজীর রাজত্বকালে হাট বাজারে দ্রব্যাদির মূল্য কি রকম ছিল সে প্রসঙ্গ আলোচনায় মন্থুহর বলেছেন

ওজানেও কম কেহ নারে বেচিবার　　খরিদদার বিক্রেতা সবে তারে রাজি
মূল্য বাড়াইয়া কেহ নারে ঠকাইবার।।　　তৈল সের বার পণ ঘৃত চারি আনা।
পাইলে নিয়ম ছাড়া শাস্তি করে গাজি।　　গাজিতে করিয়া দিল এ সব ঠিকানা।।

ভাণ্ডার ও পাকশালা প্রসঙ্গে

পাকশালা দেওয়ানখানা তোসাখান ভরি।　　মুন্সিগের মধ্য এক হাফেজ আনিয়া।
খুলিল অতিথখানা ধুমধাম করি।।　　কোরাণ পড়ায় সবে পুণ্যের লাগিয়া।।
ভাণ্ডারের অধিকারী আহাদ ভাণ্ডারী।　　হিন্দুস্থান হৈতে এক মৌলবি আনিল।
চন্দ্রমুদি করিতেছে খরচ খবরদারি।।　　আরবি এলেম ছাত্রগণে শিখাইল।।
তোলাবাখানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া।　　জুগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি।
গাজি পালে সে সকলে অন্ন বস্ত্র দিয়া।।　　শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী।।

'গাজীনামা' কাব্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার মত। এর বিষয়বস্তুর মাহাত্ম্য আছে। ত্রিপুরার ইতিহাসের একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা এই কাব্যের মধ্যে ধরা আছে। ঠিক এই জাতীয় কাব্য কোচবিহারে নেই। যদিও শুক্লধ্বজকে কেন্দ্র করে এই জাতীয় কাব্য রচিত হতে পারতো। কিন্তু রাজসভায় সাহিত্য-দৃষ্টি এত শাস্ত্রানুযায়ী ও রীতি বদ্ধ ছিল যে এই জাতীয় বিষয়বস্তুর কাব্যরূপদানের জন্য সেক মন্থুহরের মত গ্রাম্য রাজসভা বহির্ভূত কবির প্রয়োজন ছিল। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, রোসনাবাদ, উদয়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিতে কবির আখ্যানভাগের পটভূমিকা ছড়িয়ে আছে। বহু চরিত্রকে বেশ জীবন্ত করে আখ্যানভাগে উজ্জ্বল করে তুলেছেন মন্থুহর।

গাজীনামা ঐতিহাসিক কাব্য। কল্পনার অংশ এর মধ্যে থাকলেও এর মূল বিষয়বস্তু ইতিহাস থেকে খুব বিচ্ছিন্ন নয় বলেই আমার ধারণা। মৃত্যুর ঘটনাটির সঙ্গে চলতি লোকধারণার মিল নেই। কৃষ্ণমালা ও গাজীনামার মধ্যে ঐ ঘটনার অমিল আছে। গাজীনামায় দেখানো হয়েছে যে সমসের নবাবের প্রিয়পাত্র হয়েছিল, আগা বাখরের চক্রান্তে তাকে কামানের মুখে বাঁধা হয় এবং উড়িয়ে দেওয়া হয়। কৃষ্ণমালায় বলা হচ্ছে যে সমসেরকে দস্যু জেনে নিধন করা হলো। তোপের মুখে ওড়ানোর কথা সেখানে নেই। দুর্গামণির রাজমালায় আছে "তোপেতে উড়ায় গাজী সর্বলোকে দেখো" মৃত্যু সম্পর্কিত ব্যাপারে মন্থুহরকে খুব বিশ্বাস করার কারণ নেই—তিনি বীরপুরুষ ভাবেই গাজীনামা লিখেছেন।

মহাভারতে আয়ুর্বেদ ও বৈদ্যের স্থান

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর

ভারতের সুপ্রাচীন গ্রন্থরাজির মধ্যে এমন সব উক্তি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে যে, সে সব উক্তিকে অনুশীলন করতে গিয়ে বিংশ-শতাব্দীর ঐতিহাসিকগণ খুব ফাঁপরে পড়ে যান, তাঁরা ঠিক করতে পারেন না, কোন গ্রন্থ আগে রচিত হয়েছে—যেমন—মনুসংহিতার রচনার আগেই কি মহাভারত? অথবা পরে? মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের ৩৯ অধ্যায় দ্রুপদ বলেছেন—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ, প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষ্বপি দ্বিজাতয়ঃ।
দ্বিজেষু বৈদ্যাঃ শ্রেয়াংসো বৈদ্যেষু কৃতবুদ্ধয়ঃ।
কৃতবুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥

অর্থাৎ—এই সংসারে জাতমাত্র দ্রব্যের মধ্যে প্রাণীই হলো শ্রেষ্ঠ। আর প্রাণিদের মধ্যে বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিজীবী শ্রেষ্ঠ। আবার বুদ্ধিমানদের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। সেই মানুষদের মধ্যে দ্বিজগণ শ্রেষ্ঠ। (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের একটি সংজ্ঞা দ্বিজ)। আবার দ্বিজদের মধ্যে বৈদ্য শ্রেষ্ঠ, আর বৈদ্যদের মধ্যে যারা করিৎকর্মা বা সিদ্ধান্তবিৎ তারাই শ্রেষ্ঠ। আবার সেই করিৎকর্মাদের মধ্যে যারা হাতে-কলমে অর্থাৎ সিদ্ধান্তবিদ্দের মধ্যে যারা সবই প্রত্যক্ষ করেন তারাই শ্রেষ্ঠ, তাদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ যারা ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন।

মহাভারতের এই শ্লোকগুলিতে জটিলতা সৃষ্টি হয়ে আছে একমাত্র 'বৈদ্য' শব্দ নিয়ে। মহাভারতের ব্যাখ্যাকার বলেছেন—বৈদ্য মানে যাঁরা বিদ্বান। আর অমরকোষ বলেছেনে—"ভিষক্‌বৈদ্যৌ" চিকিৎসককে। অর্থাৎ চিকিৎসকের দুটি নাম ভিষক্ ও বৈদ্য।

এর দ্বারা এই দাঁড়াল যে, যারা দ্বিজ তাদের মধ্যে বৈদ্য বা চিকিৎসকই শ্রেষ্ঠ। আবার বৈদ্যদের মধ্যে যাঁরা হাতে কলমে জ্ঞানলাভ করেন তাঁরা শ্রেষ্ঠ। তাঁদের অনুভূত জ্ঞানকে যারা প্রত্যক্ষ করেন বা করান তাঁরাই শ্রেষ্ঠ।

ঠিক ওই শ্লোকগুলিই, মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ের ৯৬/৯৭ সংখ্যায় বসে আছে—

ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ।
বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নরেষু.....।

এর পরেই মনু-সংহিতার বদলে গিয়েছে কয়েকটি কথা—

বুদ্ধিমৎসু নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ।
ব্রাহ্মণেষুচ বিদ্বাংসো বিদ্বৎসু কৃত বুদ্ধয়ঃ।
কৃত বুদ্ধিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ।

অর্থাৎ মহাভারতের বক্তব্যে প্রথমটা একই। তারপর নরের পরে দ্বিজাতির জায়গায় বসেছে ব্রাহ্মণ। আবার ব্রাহ্মণের পরে বসেছে বিদ্বান। 'বৈদ্য' তখন উধাও। সেই বিদ্বানের পর আর

বাকি কথাগুলি ঠিক আছে।

তাহলে বোঝা গেল 'অমরকোষের' পরই মনু-সংহিতার শ্লোকগুলির শুদ্ধাশুদ্ধি ঘটেছে, বা এদিক ওদিক করে একটা অন্তর শ্রেণী স্থাপনের প্রয়োজন ঘটেছে।

ঠিক এমনি ঘটেছে মহাভারতের একটি প্রসিদ্ধ শ্লোক নিয়ে। সেই শ্লোকটির প্রাচীন প্রবচন "যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে"। মূল শ্লোক 'যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি নতৎ ক্বচিৎ" ঠিক ওই শ্লোকই চরক সংহিতার সিদ্ধি স্থানের ১২ অধ্যায়ের ৫৪ শ্লোক "যদিহাস্তি তদন্যত্র যন্নেহাস্তি ন তৎ ক্বচিৎ। অর্থাৎ আয়ুর্বেদের (কায়চিকিৎসা বিভাগের) যা কিছু বক্তব্য আছে এই চরক সংহিতায় সবই আছে, এতে যা নেই তা আর কোথাও নেই।"

তা হলে প্রশ্ন ওঠে কোন্ গ্রন্থ আগে রচিত হয়েছে? মহাভারত? না চরক সংহিতা?

আমরা সহজেই বুঝতে পারি যে কাল থেকে মানবগোষ্ঠী, সেই কাল থেকেই চিকিৎসা-পদ্ধতির উদ্ভব, তবে ক্রমে তার প্রগতি অবশ্যই হয়েছে, কারণ জ্ঞান-বিজ্ঞান তো আকাশ হতে ঝপাৎ করে আসে না, যত প্রয়োজন বাড়ে ততই জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতি হয়। সেই যুক্তিতে বলা যায়, মহাভারতের সমাজ যখন ভারতীয় সমাজের একটা বিশেষ দিকের নজিরে ভরা তখন আয়ুর্বেদের প্রচার ও প্রসার নিশ্চয় তার ঢের আগেই, আর বর্তমান কালে মহাভারতের আকৃতি যে ভাবে আমরা পাই, তা তো প্রথম রচনার নয়, কারণ এই মহাভারতের প্রথম নাম পুরাণ ও ইতিহাস এ দুটি এক করা ছিল না। এ কথা তো মহাভারতের আদি পর্বেই বলা হয়েছে—"দ্বৈপায়নেন যৎ প্রোক্তাং পুরাণাং পরমর্ষিণা (আদি ১।১৫) আবার পরে বলা হয়েছে—"ভারত শ্রেতি হাসস্য পুণ্যাং গ্রন্থানি সংযুতাম্"।

এ বিষয়ে অথর্ব বেদের ১১।৭।৭ সূক্তে বলা হয়েছে যাঁরা সৃষ্টি সম্বন্ধীয় অনুশ্রুতিকে রক্ষা করেন তাদিকে পুরাণবিদ্ বলা হয়। আর যাঁরা সেই পুরাতন কথাকে ধারাবাহিকের একটা রূপ রেখা টেনে বিশিষ্ট সংকলন করেন তাঁরা ইতিহাস রচনা করেন। ইতিহাস রচনার সময় পরম্পরাক্রমে আগত কাল-শ্রুতিকেও তাঁরা পুরাণের অন্তর্ভুক্ত করে থাকেন।

এই সব তথ্যের দ্বারা যেন বোঝা যায় এককালের ভারত কাব্যই পরে মহাভারত হয়েছে। আধুনিক পণ্ডিতগণ মনে করেন সুদূর অতীতের জয় কাব্য, পরে পৌরাণিক ভারত কাব্যই গুপ্তকালে এসে বৃহত্তর মহাভারত বা ভারত ইতিহাসের রূপ নিয়েছে। যে সময় থেকে মহাভারত সে সময় থেকেই বেদের পুরাণ বার্তাগুলির বহু কাহিনীই এতে জোড়া লেগে গিয়েছে।

কুরুক্ষেত্রের মূল ঘটনা বা মুখ্য ঘটনা কোন বৈদিক সাহিত্যে নাই। কিন্তু পরীক্ষিৎ পুত্র জন্মেজয় এবং শকুন্তলার পুত্র ভরতের কথা বেদের কয়েকটি ব্রাহ্মণে আছে।

যজুর্বেদের অনেক স্থলে কুরু পাঞ্চাল এবং বিচিত্রবীর্যের পৌত্র যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞের বর্ণনা দেখা যায়।

আরও বিচিত্র লাগে পতঞ্জলিতে কৌরব পাণ্ডবের নাম এবং যুধিষ্ঠির-অর্জুন ও কৃষ্ণনাম পাণিনির সূত্রে। তবে ত্রিপিটকে মহাভারতের নাম নেই। পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন, মহাভারতের রচনা বৈদিক কালের পরে এবং বৌদ্ধ-সাহিত্যের পূর্বে। কারণ মহাভারতের অনেক প্রসঙ্গ জৈন এবং বৌদ্ধ-সাহিত্যে বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে।

মহাভারতে অশ্বিনীকুমার যুগলের চিকিৎসার কথা তাঁদের স্তুতিকলারও উল্লেখ করা যায়—

"তমুপাধ্যায়: প্রত্যুবাচ, অশ্বিনৌ স্তুহি
তৌ দেব ভিষজৌ ত্বাং চক্ষুষ্মন্তং কর্ত্তরৌ—ইতি,

স এমমুক্ত: উপাধ্যায়েন উপমন্যু রশ্বিনৌ
স্তোতু মুপ চক্রমে বাগ্‌ভি: ঋগ্‌ভি:।

(মহাভারত আদি পর্ব ৩।৫৬)

এ প্রসঙ্গটি উপমন্যুর গুরুভক্তি বর্ণনায়।

আয়ুর্বেদের যে আটটি অঙ্গ শাল্য, শালাক্য, কায়চিকিৎসা, কৌমারভৃত্য, ভূতবিদ্যা, রসায়ন, বাজীকরণ এবং বিষতন্ত্র, সে সংবাদ লোক পাল সভায় (সভাপর্বে)।

নারদ এক সময় প্রশ্নের ছলে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন ওহে! তোমার শারীর ব্যাধি হলে ঔষধ এবং পথ্যের দ্বারা চিকিৎসা করছো তো? আর মানসিক রোগের জন্য জ্ঞানী বৃদ্ধের উপদেশ এবং সৎসঙ্গের সম্পর্ক ঘটাচ্ছ তো?

তোমার যিনি বৈদ্য তিনি আয়ুর্বেদের আটটি অঙ্গই জানেন তো? (সভাপর্ব ৫ অধ্যায়। ৮৯—৯০)

কচ্চিৎ শারীর মাবাধং ঔষধৈ: নিয়মেন বা। কচ্চিৎ বৈদ্যাশ্চিকিৎসায়ামষ্টাঙ্গায়াং বিশারদা:।
মানসং বৃদ্ধ সেবাভি: সদা পার্থপকর্ষসি। সুহৃদশ্চানু রক্তাশ্চ শরীরে হে হিতা: সদা॥

শ্লোকগুলি যেন চরক সংহিতার সূত্রস্থানের অন্যান্য উপদেশের মধ্যে এই প্রসঙ্গেরই বিশেষ উপদেশেরই পুনরুক্তি— মানসং প্রতি ভৈষজ্যং ত্রিবর্গস্যান্ববেক্ষণম্।
তদ্ বিদ্যসেবা বিজ্ঞানমাত্মা দীনাং চ সর্বশ:॥

অর্থাৎ শারীর ব্যাধি হ'লে যেমন পার্থিব ভেষজের দ্বারা তাদের উপশম করা হয়, তেমনি মানস রোগের জন্য বিদ্বজ্জনের সঙ্গ লাভ, ধর্ম, অর্থ, কামনার মধ্যে যে অসারত্ব মাত্রই আছে, প্রকৃত সারবস্তু মুক্তিলাভ এইটুকু চিন্তা করলে মানস-রোগের শান্তি হবে।

তারপর মহাভারতের আদি পর্বে দেখান হয়েছে—সত্যবতীর বিবাহিত-জীবনের পুত্র বিচিত্রবীর্যের মৃত্যু হয়েছিল যক্ষ্মা-রোগে। সে রোগটির বিশেষ কারণ ছিল অত্যধিক স্ত্রী-সহবাস বা রমণী সঙ্গে প্রচুর শুক্রক্ষয়। তার জন্য বিচিত্রবীর্যের চিকিৎসা করান হয়েছিল বৈদ্যের বা ভিষকের দ্বারা কিন্তু রোগ সারেনি, সেই শুক্রক্ষয়ের জন্য যক্ষ্মারোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

বিচিত্রবীর্য স্তরু নো যক্ষ্মণা সমগৃহ্যত।
সুহৃদাং যতমানানাং আপ্তৈ: সহ চিকিৎসকৈ:।
জগামাস্তমিবাদিত্য: কৌরব্য: যমসাদনম্॥ (মহাভারত) ১।১০২।

বিচিত্রবীর্যের মৃত্যুর কারণ যে শুক্রক্ষয় জন্য ক্ষয়রোগ, সেই কারণটি প্রথম বলেছেন চরক-সংহিতাকারই— আহারস্য পরংধাম শুক্রং তদ্রক্ষ্য মাত্মন:।
ক্ষয়ে তস্য বহূন্ রোগান্ মরণং চনিযচ্ছতি। চরক নিদান ৬/১৬

আর একটি তথ্যের সমাবেশও মহাভারতে দেখতে পাই—সেটি রণক্ষেত্রে বৈদ্যের প্রধান প্রয়োজন—

যুধিষ্ঠির তাঁর সেনানীবর্গের মধ্যে শত প্রকার শিল্পী যেমন রাখতেন বেতন দিয়ে, তেমনি রাখতেন শাস্ত্রবিশারদ বৈদ্যদেরও এবং প্রতিটি বৈদ্য থাকতেন তাঁর সর্বপ্রকার উপকরণ নিয়ে—

তত্রাসন্ শিল্প: প্রজ্ঞা: শতকো দত্ত: বেতনা:।
সর্বোপকরণৈর্যুক্তা: বৈদ্যা: শাস্ত্রবিশারদা:। মহা। উদ্যোগ। ১৫২। অ:।৮৩।

আবার দেখা যায় ভীষ্ম যখন সংগ্রাম-ক্লান্ত হয়ে মৃত্যুর দিন গুণছেন কণ্টক-শয্যায় তখন তাঁর চিকিৎসার জন্য দুর্যোধন এনেছেন শৈল্য-বিদ্যা-পারদর্শী বৈদ্যকে। বৈদ্য এলেন তাঁর সর্ব-প্রকার উপকরণ নিয়ে। সঙ্গে এনেছেন আরও কয়েক জন শল্য-চিকিৎসককে; কারণ শৈল্য-চিকিৎসায় চাই দ্রুত কার্য-সম্পাদনের অভিজ্ঞ বৈদ্যদের সাহায্য।

উপতিষ্ঠন্ অথো বৈদ্যা: শল্যোদ্ধরণ কোবিদা:।
সর্বোপকরনৈ: যুক্তা: কুশলা: সাধু-শিক্ষিতা:॥

এই সব শল্য-শালক্যবিদ্ বৈদ্যদের দেখে ভীষ্ম বল্লেন দুর্যোধনকে, একি করেছো দুর্যোধন! আমার এখন মৃত্যুর পথে যাত্রা, এঁদের এনে আর কি হবে? দাও দাও! এঁদের যথাযোগ্য সম্মান করে 'ফি' দিয়ে উপঢৌকন দিয়ে বিদায় করে দাও! আর আমাকে সুস্থ করার প্রয়াস ক'রছো কেন? এবার আমায় বিদায় দেবার পথই করে দাও!

ভীষ্মের শেষ কথা শুনে বিষণ্ণ হৃদয়ে দুর্যোধন সেই সব বিচক্ষণ বৈদ্যদের যথা সম্মান অর্থ ও উপঢৌকন দিয়ে বিদায় দিলেন।

তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য পুত্রো দুর্যোনস্তব।
বৈদ্যান্ বিসর্জয়ামাস পূজয়িত্বা যথার্হত:॥ মহা। ভীষ্মপর্ব—১২০। ৫৫-৫৯।

এছাড়া আজকাল যেমন সরকারের অনুমোদিত চিকিৎসকদের গাড়ীতে এবং অন্য কোন জন-সেবা প্রতিষ্ঠানে কিংবা সংগ্রামস্থলীর প্রান্তে চিকিৎসকদের জন্য একটা প্রতীক চিহ্ন রাখার নিয়ম সে নিয়মটি রামায়ণ ও মহাভারতের সমাজেও প্রচলিত ছিল যা সুশ্রুত সংহিতায় কল্পস্থানের ২৩-১৯ শ্লোকে দেখা যায়— স্কন্ধাবারে চ মহতি রাজ গেহাদনন্তরম্।
ভবেৎ সন্নিহিত: বৈদ্য: সর্বোপকরনাণ্বিত:।
তত্রস্থ মেনং ধ্বজ বৎযশ: খ্যাতি সমুচ্ছ্রিতম্।
উপসর্পন্ত্যমোহেন বিষশল্য মথার্দিতা:॥

আয়ুর্বেদের এই ব্যবস্থাটি চাণক্যের অর্থশাস্ত্রে (১০।৬২) যেমন দেখা যায় তেমনি রামায়ণের সেতুবন্ধন এবং লংকায় সেনা-সন্নিবেশের ক্ষেত্রেও একই রূপ। মহাভারতের উদ্যোগ পর্বেও ঐ রকম ভাবে আয়ুর্বেদ-উপদিষ্ট বৈদ্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাটির পূর্ণ উল্লেখ দেখা যায়। বৈদ্যগণ তাঁদের স্বতন্ত্র পদমর্যাদার প্রতীক চিহ্ন রাখতেন গাড়ীতে (রথে) এবং আবসস্থলে (ক্যাম্পে) রেড ক্রসের মত।

শব্দকথায়—প্রাতিভাসিক সম্বন্ধ

ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এক ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন শব্দের মধ্যে সাদৃশ্যের অন্বেষণ ও সম্বন্ধের আবিষ্কারণ মনুষ্যমাত্রেরই স্বভাবসিদ্ধ। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সকলেই অল্পবিস্তর philologist বা ভাষাতত্ত্বান্বেষী। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরা কিন্তু শব্দশাস্ত্রের নিয়ম না মানিয়া যেখানে সম্বন্ধ নাই সেখানে সম্বন্ধের উদ্ভাবন করিয়া থাকে। এই সম্বন্ধ প্রতিভাসিক পারমার্থিক নহে। ইহার কতকগুলি উদাহরণ গত মাসে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবারে আর কতকগুলি সন্নিবেশিত হইল।

Come ও ক্রামতি

পরলোকগত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন গল্প করিলেন—"একদিন চৌকিদারের আওয়াজ শুনিলাম—হুকুমদার। তখনই মনে হইল—ইহার মূল হইতেছে—কঃ ক্রামতি তত্র। তাহার অপভ্রংশ who comes there? তাহার আবার অপভ্রংশ হুকুমদার?" এই মত কিন্তু একেবারেই সমীচীন নহে। সংস্কৃতের কঃ ইংরাজীতে who বটে কিন্তু সংস্কৃত ক্রামতি ইংরাজীতে come নহে। ইংরাজীর come সংস্কৃত গম্। সংস্কৃতের গ সাধারণতঃ ইংরাজীতে ক হয়। যেমন সংস্কৃতে যুগ ইংরাজী yoke, সংস্কৃত গৌঃ, ইংরাজী cow।

Cow—Coward ও Cud

গোরু বড় নিরীহ, ভীরু জন্তু কিন্তু তাই বলিয়া ইংরাজী cow শব্দের সহিত coward-এর কোন সম্বন্ধ নাই। আর গোরু জাবর কাটে বটে, কিন্তু cow শব্দের সঙ্গে cud এরও কোন সম্বন্ধ নাই। ফরাসী coe, come শব্দের অর্থ লাঙ্গুল, ইহার উত্তর ard প্রত্যয় করিয়া coward হইয়াছে। "যে লাঙ্গুল প্রদর্শন করে, যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে, রণে ভঙ্গ দেয়—ইহাই coward শব্দের প্রাথমিক অর্থ। ফরাসী ভাষায় ard প্রত্যয়টী অতিশয় অর্থে ও নিন্দা বা কুৎসিত অর্থে প্রযুক্ত হইত। ইংরাজী coward, drankard, shuggard প্রভৃতি শব্দে এই অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজী sweetheart মূলতঃ sweetard। এস্থলে অতিশয় অর্থ দেখা যাইতেছে। Cud শব্দটী অনেকের মতে টিউটনিক ক্রি ধাতু হইতে আসিয়াছে, ইহার সহিত cow শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই।

মণি ও Money

অনেকের ধারণা ইংরাজী money ও সংস্কৃতের মণিশব্দ মূলত এক। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু এই শব্দ দুইটী সর্বথা অসম্বন্ধ। লাটিন ভাষায় moneta শব্দের অর্থ টাঁকশাল, ইহা হইতে money আসিয়াছে। শাব্দিকগণের মতে মূলতঃ 'ল'র পর 'ন' ছিল বলিয়া মণি শব্দের ন মূর্ধন্য হইয়াছে। ইহার জ্ঞাতি লাটিন monile (হার, নেকলেশ)।

শোক ও Shock

শোকের ফলে আমরা মনে আঘাত পাই বটে, কিন্তু আঘাতবাচক shock-এর সহিত শোক শব্দের কোন সম্বন্ধ নাই। শ্রচ্ ধাতুর অর্থ জ্বলা, এই ধাতু হইতে শোক আসিয়াছে। শোক শব্দের

প্রাথমিক অর্থ জ্বলন, তাপ, জ্বলন্ত, উত্তপ্ত: তাহার পর অর্থ হইল বিয়োগজ দুঃখ। শোক একেবারে শরীরকে জ্বলিয়ে দেয় সেই জন্য ইহাকে শোক বলে। এই অর্থ আমরা ভুলিয়া গিয়াছি, ফলে শোক অনেকটা ফিকা হইয়া গিয়াছে। ঐ ধাতু হইতেই শুচি শব্দ আসিয়াছে, তাহারও প্রাথমিক অর্থ—জ্বলন্ত, উজ্জ্বল, তাহার পর অগ্নিদগ্ধ বস্তু মালিনাশূন্য হয় বলিয়া অর্থ হইল—পবিত্র।

ভারী ও Very

বাঙ্গালা ভারী ও ইংরাজী very-র মধ্যে শব্দগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থাকিলেও শব্দ দুইটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ভার (weight) আছে যাহার তাহা ভারী (সংস্কৃত ভারিন্ শব্দ) তাহা হইতে ক্রমশঃ অর্থ হইল অত্যধিক খুব। ইংরাজী very শব্দটী লাটিন্ verus (মূলতঃ veros ও সংস্কৃত বর্ ধাতু) শব্দ হইতে আসিয়াছে উহার প্রাথমিক অর্থ সত্য তাহা হইতে অর্থ হইল যথার্থ, সত্য সত্য, ক্রমশঃ উহা ভারী শব্দের মত অতিশয়, অত্যধিক অর্থে প্রযুক্ত হইতে লাগিল। অনেকের ধারণা ইংরাজী very bad ও বাঙ্গালার ভারী বদ মূলতঃ এক। এই ধারণাও ভ্রান্ত।

প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে যখন বর্তমান লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, তখন সকলের দাদামহাশয় 'ত্রৈলোক্যনাথ চট্টোপাধ্যায় তাঁহার ভক্তদের বুঝাইয়া দিয়াছিলেন—আরে philology কি জান না? যেমন ইংরাজী Hither up আর আমাদের ইথার আও।

Sorrow ও sorry

ইংরাজীতে Sorrow শব্দ হইতে বিশেষণ হইয়াছে Sorry ইহাই আমাদের দেশের সকলের ধারণা, মূলতঃ কিন্তু শব্দ দুইটীর মধ্যে কোন সম্বন্ধ নাই। Sorrow শব্দের জ্ঞাতি জার্মান Sorgen 'দুশ্চিন্তা', যেমন Borgen macht Sorgen (ঋণ দুশ্চিন্তা উৎপাদন করে)। (frau Sorge—দুশ্চিন্তা দেবী)। Sorrow শব্দটী প্রাচীন ইংরাজীতে Sarig দুঃখানুভবকারী বা দুঃখ প্রকাশক। Sore throat প্রভৃতিতে যে Sore শব্দ দেখা যায় সেই Sore শব্দ ইহার জ্ঞাতি।

Touch ও Touchy

Touch শব্দের অর্থ স্পর্শ, আর Touchy শব্দের অর্থ—ক্রোধন, কোপনস্বভাব, অত্যন্ত অভিমানী। মনে হয় Touch হইতেই Touchy আসিয়াছে (যেমন bloody, crafty, dusty, foamy, flowery), যে স্পর্শমাত্র সহ্য করিতে পারে না, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে কিন্তু Touch শব্দের মূলে দ্বারে আঘাত করিলে যে টক্ টক্ (toc toc) শব্দ হয় তাহাই।

স মা লো চ না

প্রসঙ্গ : জঁা পোল সাত্র : তন্ময় দত্ত সম্পাদিত ; বিদ্বৎসাহী প্রকাশক ৩, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা—৭০০ ০০১, পৃ: ১৬০, মূল্য : ১৮ টাকা।

সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের একজন বিতর্কিত দার্শনিক ব্যক্তিত্ব—জঁা পোল সার্ত্র। সার্ত্র কেবলমাত্র প্রখ্যাতনামা দার্শনিক নন, তিনি একজন বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার ও নাট্যকারও বটেন। তাঁর পেলব সাহিত্য-শিল্পীসত্তা প্রবল দার্শনিক সত্তার আড়ালে চাপা পড়ে গেছে। আশ্চর্যের বিষয়, সমালোচকেরাও দর্শনের আলোকেই সার্ত্রের সমগ্র মানসিকতাকে পর্যালোচনা করতে প্রয়াসী হন। প্রমাণস্বরূপ সম্প্রতি প্রকাশিত তন্ময় দত্ত সম্পাদিত 'প্রসঙ্গ : জঁা পোল সার্ত্র' গ্রন্থটির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই গ্রন্থের প্রতিটি প্রবন্ধেই সার্ত্রের দর্শন ও দার্শনিক মতবাদের উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং এমনকি, তাঁর ছোটগল্প, নাটক ও উপন্যাসের আলোচনাতেও প্রাধান্য পেয়েছে সার্ত্রের দার্শনিক চিন্তাভাবনার উগ্রতা। এই উগ্রতা প্রশমনের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, যদি সম্পাদক লেখক ও লেখা নির্বাচনে সবিশেষ সতর্ক হতেন। এদিক থেকে তাঁর দুর্বলতাই যে এই গ্রন্থের অন্যতম ত্রুটি তা অস্বীকার করা যায় না।

আমাদের দেশে ও বাংলা সাহিত্যে জঁা পোল সার্ত্রের পরিচিতি আজকের নয়। চল্লিশের দশক থেকেই সার্ত্রের বিভিন্ন রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটেছে। তিনি যেমন বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনার বিষয় হয়েছেন, তেমনি তাঁর বিভিন্ন রচনা বাংলায় অনুবাদ হয়েছে এবং যেসব অনুবাদ তৎকালীন বিশিষ্ট পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেসব পত্রিকার অনেকেরই অস্তিত্ব আজ আর নেই সেদিক থেকে গ্রন্থকারে সার্ত্রের নিজস্ব কিছু রচনার অনুবাদ এবং সার্ত্র সম্পাদিত কয়েকটি প্রবন্ধের সংকলন করে সম্পাদক তন্ময় দত্ত সার্ত্র প্রেমিক বাঙ্গালী পাঠক সমাজের কাছে নিংসন্দেহে কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

'প্রসঙ্গ : জঁা পোল সার্ত্র' গ্রন্থে সার্ত্রের নিজের লেখা কিছু রচনার অনুবাদ করা হয়েছে। যেমন, 'সার্ত্রের চোখে সার্ত্র' শিরোনামে সার্ত্রের আত্মজীবনীর কিছু অংশ অনূদিত হয়েছে। 'লেখা কি'? 'সাহিত্য কি গ্রন্থের ভূমিকা' এবং 'নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যানের বক্তৃতা' শীর্ষক রচনাগুলিও সার্ত্রের। প্রবন্ধটি যথাক্রমে তন্ময় দত্ত, অক্ষিকু ভট্টাচার্য, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় এবং অপূর্বনারায়ণ রায় অনুবাদ করেছেন। অনুবাদগুলি উন্নতমানের নয় এবং সেই কারণেই পাঠকসমাজের কাছে সার্ত্রের রচনা বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি।

দুটি বিদেশী লেখা বাংলায় অনূদিত হয়ে এই সংকলনে গ্রথিত হয়েছে। একটি সার্ত্রের জীবন-সঙ্গিনী সিমোন দ্য বভোয়ারের আত্মজীবনী থেকে নির্বাচিত অংশের অনুরূপ : শিরোনাম দেওয়া হয়েছে 'শ্রীমতী বভোয়ার চোখে সার্ত্র' এবং মার্কসবাদী সাহিত্য সমালোচক ম্যাক্স এড়ারেথের রচনা

'অঙ্গীকার বদ্ধতা সম্পর্কে সার্ত্রের সংজ্ঞা'। শ্রীমতী বভোয়ারের চোখে সার্ত্রের সমগ্র জীবনের বিবর্তিত ভাবধারার চিত্রটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান্। 'অঙ্গীকারবদ্ধতা সম্পর্কে সার্ত্রের সংজ্ঞা' রচনাটিও নির্বাচিত অধ্যায়টুকু অনুবাদের জন্য আমাদের অতৃপ্তি থেকে যায়। যদিও আরও উন্নতমানের অনুবাদ এখানে প্রয়োজন ছিল।

জঁা পোল সার্ত্রের রচনা প্রসঙ্গে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারবিশ্লেষণকারী কয়েকটি মৌলিক প্রবন্ধও এই সংকলন গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সার্ত্র / রাজনীতি : বুদ্ধিপ্রাপ্তির ভূমিকা' প্রবন্ধটিতে সার্ত্রের রাজনৈতিক মতবাদ ও তাঁর সক্রিয় ভূমিকার বিশ্লেষণ সহজ ও স্পষ্ট হয়নি। অনেক সময় মনে হয়েছে লেখক নিজেই অস্পষ্টতার সঙ্গে রোগাক্রান্ত। কেননা, তিনি সার্ত্রের রাজনৈতিক চেতনা বা মানসিকতাকে চিনে উপলব্ধি করে যতটা না বুঝিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি উপলব্ধি না করে আন্দোলন সম্পর্কিত সার্ত্রের বিবিধ ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্য বিষয় অধিকতর অস্পষ্ট করে তুলেছেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক আন্দোলনে সার্ত্রের যোগদান এবং সেইমত আন্দোলনের মর্মরহস্য উদ্ঘাটনকারী ভাষণের একটি আনুপূর্বিক তালিকা তৈরি করেছেন প্রবন্ধে। এটার প্রয়োজনীয়তা আছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এগুলিকে যথাযথ সদ্ব্যবহার করে সার্ত্রের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে শমীকবাবু নিজস্ব দৃষ্টির রশ্মিতে আলোকিত করতে পারেননি।

'জ্যঁা পোল সার্ত্র : অস্তিবাদ ও মার্কসবাদ' প্রবন্ধে ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার সার্ত্রের অস্তিবাদী ধ্যানধারণার পাশাপাশি মার্কসবাদী চিন্তাধারার মৌলিক পার্থক্য নির্ধারণে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন ; অস্তিবাদের বিচার-বিশ্লেষণে সার্ত্রের মৌল জীবন দর্শনের পরিচয় সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে এবং এই আলোচনায় তাঁর মুন্সিয়ানা অস্বীকার করা যায় না। পরিভাষাগত কিছু জটিলতা থাকলেও পরিবেশনার সহজ কৌশলে প্রবন্ধের বক্তব্য সাধারণ পাঠকের বোধগম্যে কোন অসুবিধা হয় না।

'অস্তিত্ববাদের ভূমিকা : সার্ত্র' প্রবন্ধে ডক্টর তুষার নিয়োগীর অস্তিত্ববাদ প্রসঙ্গ আলোচনায় নিজস্ব চিন্তার অভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিভিন্ন লেখা থেকে সংকলিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তুষারবাবু তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। ভাষাগত জড়তা ও স্বচ্ছতার অভাবে তাঁর প্রবন্ধ অনেকাংশে অস্পষ্টতাদোষে দুষ্ট বলা যায়। আজকের দিনে বাংলা গদ্যভাষা যে কত জটিল ও দুর্বোধ্য হতে পারে প্রমাণস্বরূপ এই প্রবন্ধের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করে দেখানো যেতে পারে : 'স্বরূপ হল একধরণের নাস্ত্যর্থক স্বভাব। নাস্ত্যর্থক স্বভাব অস্তির পূর্বেও নেই, অপিচ, অস্তিত্ব বহির্ভূত কোনো ব্যাপারও তা নয়। যে মানুষ হয়ে ওঠে, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই সত্তা এক ধরনের নাস্ত্যর্থকভাবে প্রশ্রয় দেয়, যে নাস্ত্যর্থকতা অস্তিত্বের স্বতঃপ্রবাহের মধ্যে নেই।'

নয়নকুমার মিত্র প্রণীত "কামুর 'দি আউটসাইডার' : সার্ত্রের মূল্যায়ণ" রচনাটির শিরোনামেই বোঝা যায় যে কামুর গ্রন্থ সম্পর্কে সার্ত্রের মতামতকে নয়নবাবু প্রকাশ করেছেন মাত্র। এই রচনায় তাঁর মৌলিক চিন্তার কোন পরিচয় নেই। এই প্রসঙ্গে লেখকের মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য : 'দার্শনিক ও লেখক জঁা পোল সার্ত্র যেভাবে ও যে দৃষ্টিকোণ থেকে কামুর বইটির মূল্যায়ণ করেছেন আমি তা পাঠকদের কাছে বর্ণনা করেছি মাত্র।'

'জঁা পোল সার্ত্র ও মার্কস্‌বাদ' প্রবন্ধে মুরারি ঘোষ সার্ত্রের কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের

পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারার আলোচনা করেছেন। আলোচনায় নিজস্ব আস্থা আছে। সার্ত্রের মতে—অস্তিবাদের সঙ্গে মার্কসবাদের কোনবিরোধ নেই—এই মন্তব্য কি সহজে মেনে নেওয়া যায়? এই প্রসঙ্গে পরিষ্কার আলোচনা হয়নি। প্রবন্ধটি আকস্মিকভাবে শেষ হয়েছে এবং সেই কারণে বক্তব্য বিষয়ের ধারণায় যথার্থ পরিণতি নেই।

সংকলন গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ সতীনাথ চক্রবর্তীর 'বিজ্ঞান মার্কসবাদ ও সার্ত্রের অস্তিবাদী দর্শন'। এই একই প্রসঙ্গে ইতোপূর্বে ধ্রুবজ্যোতি মজুমদার ও মুরারি ঘোষের রচনা পেয়েছি। তবে উক্ত দুইটি প্রবন্ধের তুলনায় সতীনাথবাবুর প্রবন্ধ বিশেষ স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। মার্কসবাদী ও অস্তিবাদী উভয় দর্শনেই লেখকের পারঙ্গমতা অনস্বীকার্য। বহু গ্রন্থ পঠিত ও গবেষণাধর্মী মানসিকতায় প্রবন্ধটি হীরকোজ্জ্বলে দ্যুতিময় হয়ে উঠেছে। মার্কসবাদ প্রসঙ্গে লেখকের আত্যন্তিক দুর্বলতা খানিকটা নিরপেক্ষ গুণ খর্ব করলেও আলোচনার দক্ষতায় তা অনেকটা ম্লান হয়ে গেছে। মার্কসবাদের উৎসসন্ধান এবং তাঁর ক্রমবিকাশের একটি সুন্দর রূপ রেখাঙ্কনে লেখকের পরিণত মনীষার স্বাক্ষর চিহ্নিত। অস্তিবাদী দর্শনের বিশেষ, সার্ত্রের দার্শনিক ধ্যান-ধারণার বিবর্তনও তিনি দেখিয়েছেন অতি কৌশলে। যদিও আরো বিশ্লেষণের প্রয়োজন ছিল এবং ১৯৫৭ সালে একটি পোলিশ পত্রিকায় প্রকাশিত সার্ত্রের অস্তিবাদ ও মার্কসবাদ নিয়ে রচনা সম্পর্কে খানিকটা আলোকপাত অবশ্যই প্রত্যাশিত ছিল। সতীনাথবাবুর প্রবন্ধের আর একটি বিশেষ গুণ ভাষা। জটিল বিষয়ও সহজ ভাষাভঙ্গিতে সরল ও বোধগম্য হয়েছে। লেখকের সহজাত ও প্রচ্ছন্ন আবেগে ভাষায় এসেছে সাহিত্যিক প্রসাদ গুণ এবং এই গুণই সতীনাথবাবুর প্রবন্ধের অন্যতম ঐশ্বর্য।

'জাঁ পোল সার্ত্র: সাহিত্যে অস্তিত্ববাদ' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। সার্ত্রের দার্শনিক মতবাদ কতখানি তাঁর বিভিন্ন রচনায় অর্থাৎ ছোটগল্প উপন্যাস বা নাটকে প্রকাশিত হয়েছে তারই বিশদ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ডঃ বিজয় দেব সাহিত্যের আলোচনায় সার্ত্রের সাহিত্যগুণকে একেবারেই উপেক্ষা করেছেন। সাহিত্যগুণের পটভূমিতে কতটা দর্শনের আলো বিচ্ছুরিত হয়েছে এই পদ্ধতিতে আলোচনা করলে প্রবন্ধটির মূল্য নিঃসন্দেহে আরো বেড়ে যেত।

'জাঁ পোল সার্ত্র: নাট্যকার' শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা প্রবন্ধ। এই সংকলন গ্রন্থে শমীকবাবুর আর একটি প্রবন্ধ ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। নাট্যকার সার্ত্রের পরিচয় প্রকাশ করতে গিয়ে শমীকবাবু মিশেল দ্য বভোয়ারের উক্তিকেই একমাত্র শিরোধার্য করেছেন। নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত প্রকাশে প্রয়াসী হননি। মৌলিক চিন্তার অভাবে এবং বিশেষত সার্ত্রের নাট্যরীতি ও নাট্যবোধের তেমন পরিচয় না থাকায় প্রবন্ধটি বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি।

সংকলন গ্রন্থের শেষে পুষ্কর দাশগুপ্ত সংগৃহীত 'জাঁ পোল সার্ত্র ও তাঁর সমকাল' শিরোনামে সার্ত্রের দীর্ঘ জীবনের ঘটনাপঞ্জী ও সমকালীন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিবরণ একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। এটি গ্রন্থের মর্যাদা ও মূল্য অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছে। আবার তেমনি প্রতিটি পৃষ্ঠায় অসংখ্য বানানভুল গ্রন্থের আভিজাত্যকে বহুলাংশে গ্রাস করেছে। আশিস্ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচ্ছদ প্রশংসনীয় এবং ছাপা ও বাঁধাই চলনসই।

অধীর দে

Indian Tube: The lifeline that touches all our lives.

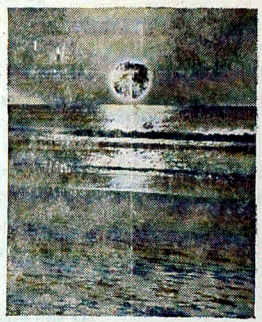

That's how we see ourselves.
Wherever people are.
To them, we bring food, water, fuel and power.
And make their leisure, pleasurable.
For nearly thirty years, which make us one of the oldest tube manufacturing companies in the country, Indian Tube has been involved in almost every major national effort towards self-sufficiency.
Agriculture, transportation, thermal power generation, petroleum exploration, nuclear research.
Major pipelines constructed from hundreds of miles of tubes made by us traverse the land to bring a better life to its people.
Unseen and unheard.
But very much there. Just like the veins and arteries of our bodies.

ITC INDIAN TUBE
Building lifelines.

ACIL/IT-2/82

Super Heater India
194/1/3 G. T. ROAD
SALKIA HOWRAH - 711106

MANUFACTURERS OF V. B. CYLINDERS
PISTONRODS. SUPER HEATER ELEMENTS
Phone : - 66-2064